প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা

ডিপিএড

পেশাগত শিক্ষা

চতুর্থ খণ্ড

তথ্যপুস্তক

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)

ময়মনসিংহ

ডিসেম্বর ২০১৯

পেশাগত শিক্ষা (চতুর্থ খণ্ড)

প্রথম সংস্করণ ও পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৪	পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯
লেখক দিলীপ কুমার সরকার মির্জা মো: দিদারুল আনম কমল বরণ বিশ্বাস মো: মাহবুবুল আলম সিদ্দিকী	**লেখক** অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম মো: আলমগীর হোসেন সাব্বির আহমেদ চৌধুরী দিলিপ কুমার সরকার মাহবুবুল আলম সিদ্দীক
বিশেষজ্ঞ পাঠক ড. আবুল এহসান আনিসা হক ড. হ্যাপি দাস	**বিশেষজ্ঞ পাঠক** ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক
পরামর্শক আনিসা হক জেন ডেবুরু	**পরামর্শক** -
কারিগরি পরামর্শক ও গ্রুপ লিডার ড. হ্যাপি দাস সিরাজ উল্লা (এপ্রিল, ২০১১- ডিসেম্বর, ২০১১)	**কারিগরি পরামর্শক ও সমন্বয়ক** মো: আলমগীর হোসেন
কারিগরি পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান প্রফেসর শামিম আহমেদ টিম লিডার ডিপিএড কার্যক্রম	**কারিগরি পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান** মো: আলমগীর হোসেন
সম্পাদনা মো: শামীম ইউসুফ রতন কুমার সরকার	**সম্পাদনা** অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী মো: আলমগীর হোসেন

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার মানোন্নয়নে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) কোর্সটি সুদীর্ঘকাল উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক সি-ইন-এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শিখন চাহিদায় পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে শিক্ষক-উন্নয়ন কার্যক্রমেরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রচলিত সি-ইন-এড কোর্সটিকে পরিবর্তন করে ২০১১ সালে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডিপিএড এর ৭টি বিষয়ের ১০টি তথ্যপুস্তক ও ইন্সট্রাক্টরদের জন্য ১০টি নির্দেশিকা ছাড়াও শিক্ষাক্রম, মূল্যায়ন নির্দেশিকা, পিটিআই শিক্ষার্থী এবং প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের জন্য ৩টি নির্দেশিকাসহ মোট ২৯টি ডিপিএড সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে ২০১২ সালের জুলাই মাস থেকে ৭টি পিটিআইতে ডিপিএড কোর্সটি চালু করা হয়। সরকার ডিপিএড কোর্সের চাহিদা মোতাবেক জনবল ও ভৌত সুবিধা সৃষ্টি করার প্রয়োজনে পিটিআইসমূহে পর্যায়ক্রমে এই কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরীক্ষামূলকভাবে চালুকৃত কোর্সটি সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে ২০১৩ সালের জুলাই মাস থেকে ২৯টি, ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৩৬টি, ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৫০টি, ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৬০টি এবং ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস হতে ৬৬টি পিটিআইতে তা সম্প্রসারিত হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণের পর ২০১৯ সালে ৬৭টি পিটিআইতে ডিপিএড কোর্স চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রচলিত সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) থেকে ডিপিএড কোর্সটির ধ্যান ধারণাসহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নতুন। কোর্সটিকে মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে কোর্স সামগ্রী ও নির্দেশিকা সামগ্রীগুলোতে পিটিআই এর প্রয়োজনে পরিমার্জন প্রয়োজন হয়। সে অনুসারে ২০১৪ সালে পুস্তকগুলোতে মুদ্রণভ্রান্তিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সুপারিশকৃত কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ডিপিএড কোর্সের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিবছর পিটিআইসমূহ মনিটরিং করে। নেপ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ১০টি মনিটরিং প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। উক্ত মনিটরিং প্রতিবেদন, পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং সুপারিনটেনডেন্টগণের সুপারিশের আলোকে ২০১৫ সালে কোর্স সামগ্রী এবং নির্দেশিকা বইগুলোতে কিছু নতুন বিষয় সংযোজন এবং উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু এবং নির্দেশনা বাস্তব ও মানসম্পন্ন করে পরিমার্জন করা হয়েছে। এই কোর্সটির টিম লিডার এবং গ্রুপ লিডারগণ মনিটরিং রিপোর্টের তথ্য ও সুপারিশ বিশ্লেষণ করে উল্লিখিত ডিপিএড সামগ্রীগুলোতে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, সংযোজন ও বিয়োজন

করেছেন। সফলভাবে পরিমার্জনের কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব মোঃ নাজমুল হাসান খান, মরহুম মোঃ ফজলুর রহমান, টিম লিডার প্রফেসর শামিম আহমেদসহ গ্রুপ লিডার, লেখক এবং সম্পাদকবৃন্দকে আমি জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এই পরিমার্জন কাজে নেপ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ডিপিএড কোর্সের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা (নেপ) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। সে প্রেক্ষিতে আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৮ সালে ১০টি ডিপিএড কোর্স সামগ্রী-তথ্যপুস্তক এবং পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ১০টি নির্দেশিকা পরিমার্জন করে। এক্ষেত্রে এনসিটিবি এর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের সাথে ডিপিএড এর বিষয়বস্তুর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। তাছাড়া এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত শিক্ষক সংস্করণের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সাথে মিল রেখে ডিপিএড এর পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আই.ই.আর কর্তৃক নির্বাচিত লেখকবৃন্দ, রিভিউয়ারগণ এবং ডিপিএড টিম যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। এজন্য আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আই.ই.আর এর পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার এবং ডিপিএড কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক ড. শারমীন হক বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, সেজন্য আমি পরিচালক মহোদয়, কোর্ডিনেটর ও ডিপিএড টিম এর নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আমাদেরকে অনেক সহযোগিতা করেছেন। সেজন্য আমি পরিচালক মহোদয় ও তাঁর সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। অনুরূপভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয় বিভিন্নভাবে সহায়তা ও পরামর্শ দিয়েছেন, সেজন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) মহোদয়সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সুচিন্তিত নির্দেশনায় এই পুস্তকগুলোর কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন সম্ভব হয়েছে। সেজন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি মনে করি এই পরিমার্জিত পুস্তকগুলো পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহায়তা দিয়ে কোর্সটির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মান অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মোঃ শাহ আলম
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ।

পরিমার্জিত সংস্করণের ভূমিকা ২০১৯

ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ কার্যক্রম সম্পন্ন করার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জন করবেন বলে আশা করা যায়। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আইইআর এ কার্যক্রমের সাথে আনুষ্ঠানিক ভাবে যুক্ত হয়। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী আইইআর ডিপিএড কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীবৃন্দের সনদ প্রদান করার পাশাপাশি এ কার্যক্রমের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করছে। সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে ডিপিএড শিক্ষাক্রম, তথ্য পুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জন অন্যতম।

শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জনের কাজ একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সম্পাদন করা হয়েছে। এ পরিমার্জনের একটি অন্যতম ভিত্তি ছিল ডিপিএড মানোন্নয়নের ক্ষেত্র শনাক্তকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত চাহিদা নিরূপণ (Need assessment)। পরিমার্জনের প্রথম ধাপটি ছিল বর্তমানে প্রচলিত ডিপিএড শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পর্যালোচনা। চাহিদা নিরূপণ থেকে ডিপিএড কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকের ওপর প্রাপ্ত ফলাফল এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রম ও পুস্তক মূল্যায়ন নীতিমালা অনুসরণ করে পর্যালোচনার বিষয়ভিত্তিক সূচক নির্ধারণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞ পর্যালোচকগণ নির্ধারিত সূচকসমূহের আলোকে শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন তৈরি করেন।

ডিপিএড-এর প্রতি বিষয়ের শিক্ষাক্রম, তথ্য পুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জনের জন্য বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হয়। বিশেষজ্ঞ দলে আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষকবৃন্দের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক, নেপ এর অনুষদ সদস্যবৃন্দ, পিটিআই এর সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট ও ইনস্ট্রাক্টর এবং ডিপিই এর কর্মকর্তাগণ কাজ করেছেন। প্রতিটি বিষয়ের পর্যালোচনা প্রতিবেদন, চাহিদা নিরূপণ গবেষণার ফলাফল এবং পরিমার্জিত প্রাথমিক শিক্ষাক্রম অনুযায়ী একটি নির্দেশনা প্রস্তুতপূর্বক বিশেষজ্ঞ দলের নিকট সরবরাহ করা হয়। প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের ওপর অর্পিত পরিমার্জনের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করেন যা পরবর্তিকালে বিভিন্ন স্তরে পরিমার্জন ও সম্পাদনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়।

এই পরিমার্জিত সংস্করণে *পেশাগত শিক্ষা (চতুর্থ খণ্ডে)* যে পরিবর্তনগুলো স্থান পেয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলো হলো তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতা, শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যবহার করে পরীক্ষার ফলাফল তৈরী, ডাটাবেস এর প্রারম্ভিক ধারণা, প্রাথমিক শিক্ষায় বর্তমানে ব্যবহৃত ডাটাবেস পরিচিতি ও ব্যবহার, ই-মনিটরিং, ওয়েবপেজ ও তথ্য খুঁজে বের করা, নির্ভরযোগ্য তথ্য উৎস, পেশাগত উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অন্তর্ভূক্তিকরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট ইস্যুসমুহ যেমন- সাইবারবুলিং ও সাইবার ক্রাইম এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ধারণা ধারাবাহিক ও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

'পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯'-এ যে সকল সংযোজন-বিয়োজন সম্পাদিত হয়েছে তা ডিপিএড কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে বিশ্বাস করছি। পরিমার্জনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন

করার জন্য বিভিন্ন বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, লেখক, সম্পাদক ও সমন্বয়কবৃন্দকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এই পরিমার্জন কাজে আইইআর ডিপিএড টিমের সম্মানিত সদস্যগণ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে তাঁদের ভূমিকা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকাসহ ডিপিএড মানোন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আইইআর ডিপিএড টিমকে সর্বাত্মক সহায়তা ও সমর্থন প্রদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, আইইআর-এর প্রাক্তন পরিচালকবৃন্দ অধ্যাপক মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, অধ্যাপক ড. আবদুল আউয়াল খান ও অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম এবং আইইআর এর অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সচিব, অতিরিক্ত সচিববৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি যারা ডিপিএড কার্যক্রমের মানোন্নয়নে আইইআর এর গৃহীত কর্মকাণ্ডে সমর্থন দিয়ে আসছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও পরিচালক (অর্থ ও সংগ্রহ) সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি জানাচ্ছি অশেষ কৃতজ্ঞতা যারা বিভিন্ন সময়ে আইইআর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর বর্তমান ও প্রাক্তন মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ যারা এ পরিমার্জন কাজে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে, 'পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯' ডিপিএড কোর্সের মানোন্নয়ন তথা প্রাথমিক শিক্ষকগণের প্রত্যাশিত শিক্ষকমান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করছি।

অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার
পরিচালক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. শারমিন হক
কো-অর্ডিনেটর (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)
ডিপিএড মান উন্নয়ন কর্মসূচি
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল মালেক
কো-অর্ডিনেটর
ডিপিএড মান উন্নয়ন কর্মসূচি
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা নম্বর
	শিখন-শেখানো কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)		
১	**১.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) পরিচিতি, তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতা**		
	১.১.১	তথ্য প্রযুক্তির ধারণা, তথ্য প্রযুক্তির ডিভাইসসমূহ	
	১.১.২	তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতা	
	১.১.৩	শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	
	১.১.৪	কম্পিউটার পরিচিতি - কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার	
	১.১.৫	কম্পিউটার চালু ও বন্ধকরণ, ফোল্ডার ও ফাইল খোলা ও ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম খোলা, মেমোরিডিভাইসে তথ্য সংরক্ষণ কৌশল	
২	**১.২ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে মৌলিক দক্ষতা: ওয়ার্ড প্রসেসিং**		
	১.২.১	মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর কাজ এর তালিকা	
	১.২.২	ডকুমেন্ট খোলা ও সেভ করা	
	১.২.৩	টেক্সট কম্পোজ, সম্পাদনা ও ফরম্যাটিং	
	১.২.৪	টেবিল, ছবি, শেপ, পৃষ্ঠা নম্বর ইত্যাদি ইনসার্ট ও এডিট করা	
	১.২.৫	পেজ সেটআপ ও প্রিন্টকরা	
	১.২.৬	একটি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট তৈরি ও জমাদান	
৩	**১.৩ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে মৌলিক দক্ষতা: মাইক্রোসফট এক্সেল**		
	১.৩.১	ডকুমেন্ট খোলা ও সেভ	
	১.৩.২	ডাটাএন্ট্রি, সংরক্ষণও সম্পাদনা	
	১.৩.৩	পরীক্ষার ফলাফল তৈরী	
	১.৩.৪	ডাটাবেস এর প্রারম্ভিক ধারণা	
	১.৩.৫	প্রাথমিক শিক্ষায় বর্তমানে ব্যবহৃত ডাটাবেস পরিচিতি ও ব্যবহার	
	১.৩.৬	ই-মনিটরিং	
৪	**১.৪ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে মৌলিক দক্ষতা: ইন্টারনেট ও শিক্ষায় এর ব্যবহার**		
	১.৪.১	ইন্টারনেট কী?	
	১.৪.২	ইন্টারনেট সংযোগ	
	১.৪.৩	সার্চ ইঞ্জিন (যেমন- গুগল)	
	১.৪.৪	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (যেমন- ফেসবুক, টুইটার)	
	১.৪.৫	ওয়েবপেজ ও তথ্য খুঁজে বের করা, নির্ভরযোগ্য তথ্য উৎস	
	১.৪.৬	ফাইল ও ইমেজ ডাউনলোড করা	
	১.৪.৭	ই-মেইল আদান-প্রদান	
৫	**১.৫ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে মৌলিক দক্ষতা: পাওয়ার পয়েন্ট**		

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
	১.৫.১ মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট ফাইল খোলা ও সেভ ১.৫.২ স্লাইড তৈরি, সম্পাদনা ও ফরম্যাটিং ১.৫.৩ স্লাইডে অবজেক্ট সংযোজন: টেবিল, ছবি, শেপ ইত্যাদি ইনসার্ট ও এডিট করা	
৬	**১.৬শিখন শেখানো কার্যক্রম ও পেশাগত উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয়** ১.৬.১ শ্রেণি শিখনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ১.৬.২ ইন্টার একটি ভকনটেন্ট/ই কনটেন্ট/ই-বুক এর উৎস ও ব্যবহার ১.৬.৩ ডিজিটাল কনটেন্ট পরিচিতি, গুরুত্ব ও ব্যবহারের বিবেচ্য বিষয় ১.৬.৪ ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি (ইন্টারেক্টিভ, এনিমেটেড, ইনোভেটিভ) ১.৬.৫ পেশাগত উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অন্তর্ভূক্তিকরণ	
৭	**১.৭ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট ইস্যুসমুহ** ১.৭.১ ব্যক্তিগত ইস্যু ১.৭.২ পারিবারিকইস্যু ১.৭.৩ সামাজিকইস্যু ১.৭.৪ অর্থনৈতিকইস্যু ১.৭.৫ নৈতিকইস্যু ১.৭.৬ ব্যবস্থাপনাইস্যু ১.৭.৭ সাইবারবুলিং ১.৭.৮ সাইবার ক্রাইম ১.৭.৯ সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০১৫ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন ২০১৩	
	গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা	
৮	১.৮ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ১.৮.১ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ১.৮.২ সংযোজনী, মজুত যাচাই ও শ্রেণিকরণ ১.৮.৩ ক্যাটালগ ও লেনদেন পদ্ধতি ১.৮.৪ গ্রন্থাগার ব্যবহার ১.৮.৫ ডিজিটাল লাইব্রেরি (ই-লাইব্রেরি) ব্যবহার	

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)

১. শিখন-শেখানো কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)

১.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) পরিচিতি, তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতা

১.১.১ তথ্য প্রযুক্তির ধারণা, তথ্য প্রযুক্তির ডিভাইসসমূহ

সাধারণ অর্থে লোকে তথ্য প্রযুক্তি বলতে কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়াদিকে বুঝে থাকেন। কিন্তু তথ্য প্রযুক্তি আরো ব্যাপক এবং এর ব্যবহারও বিস্তৃত। এখানে এক দিকে রয়েছে তথ্য বা বিভিন্ন ঘটনা আর অন্যদিকে রয়েছে প্রযুক্তি যা মূলত বিজ্ঞানের অবদান বা আবিষ্কার। তাহলে এ কথা বলা যায় যে, তথ্য প্রযুক্তি হলো এমন কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও ইলেকট্রিক যন্ত্রাংশ যেগুলোর সাহায্যে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ বা ধারণা, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, যোগাযোগ, বিনিময় বা পরিবেশনা ব্যবস্থার সম্মিলিত রূপ বা ফলাফল। আধুনিক মানব জীবনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র। তথ্য বা ঘটনার আদান প্রদান ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির নিবিড় সম্পর্কের ফলে বর্তমানে একে কেউ কেউ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology -ICT) বলে অভিহিত করে থাকেন। অন্য দিক দিয়ে একে কম্পিউটার ও অন্তর্জাল (Internet) নির্ভর প্রযুক্তি বলা যেতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বজনস্বীকৃত একক কোন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব না। United Nations Development Programme (UNDP) এর মতে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হল তথ্য ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার যা মূলত বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র, অ্যাপ্লিকেশন ও সার্ভিস এবং এর সাহায্যে তথ্য উৎপাদন,সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরন ও বিনিময় করা যায়। Techopedia অনুযায়ী টেলিকমিউনিকেশন, ব্রডকাস্ট মিডিয়া, ইনটেলিজেন্ট বিল্ডিং সিস্টেম, অডিও ভিজুয়াল প্রসেসিং ও ট্রান্সমিশন সিস্টেম এবং নেটওয়ার্কবেজড কনট্রোল ও মনিটরিং ফাংশন পরিচালনা করার জন্য ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় সকল প্রযুক্তিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলে। সহজভাবে বলা যায়, বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ভিত্তিক প্রযুক্তির পাশাপাশি গতানুগতিক প্রযুক্তি, যেমন-রেডিও, টেলিভিশন ও টেলিফোন প্রযুক্তিও এর অর্ন্তভুক্ত। এক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ কাজগুলো কত সহজে ও কার্যকরিভাবে সম্পন্ন করা যায় সেটাই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সাধারণত কাজ করে দুই ধরণের উপকরণ বা প্রযুক্তির সমন্বয়ে। এই দুই প্রকার প্রযুক্তিকে যথাক্রমে সফটওয়্যার ও হার্ডওয়ার বলে। সফটওয়্যার হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সেই অংশ

যেগুলো দেখা ও ধরা ছোঁয়া যায় না কিন্তু কাজে কর্মে তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। মূলত সফটওয়ারের মাধ্যমে হার্ডওয়ারগুলো কাজে সক্রিয় থাকে এবং তথ্য ও যোগাযোগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে হার্ডওয়্যার হল সেই সব অংশ যা দৃশ্যমান এবং ছোঁয়া যায়, যার কাঠামো আছে। নিম্নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ডিভাইসসমূহ বনর্না করা হলো:

ক্যালকুলেটর

ক্যামেরা

রেডিও

স্যাটেলাইট

টেলিভিশন

চিত্র: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ডিভাইসসমূহ

সফটওয়ার: তথ্য ও যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য যে সকল কম্পিউটার প্রোগ্রামসমূহ ব্যবহার করা হয়ে থাকে যন্ত্রাংশগুলোতে বা যন্ত্রাংশগুলো সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য যে নির্দেশনা প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে যন্ত্রগুলোতে সেগুলোই মূলত সফটওয়্যার। নানা ধরণের সফটওয়্যার রয়েছে। যেমন: কম্পিউটার পরিচালনার জন্য অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ, লিনাক্স, ম্যাক ওএস, এমএস ডস প্রভৃতি।

হার্ডওয়ারঃ আগেই বলা হয়েছে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দৃশ্যমান যা ধরা ও ছোঁয়া যায় এমন যন্ত্রাংশসমূহই হলো হার্ডওয়ার। নানা ধরণের হার্ডওয়ার বা তথ্য প্রযুক্তি ডিভাইস রয়েছে। যেমন একটি কম্পিউটারের ডিভাইসসমূহ হলো মনিটর, মাউস, কেসিং, মাদারবোর্ড ইত্যাদি। এক কথায় কম্পিউটারের ইনপুট ডিভাইস ও আউটপুট ডিভাইসসহ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল যন্ত্রাংশকে একসাথে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বলা হয়। আরো যে সকল তথ্য প্রযুক্তি ডিভাইস রয়েছে সেগুলো হলো ল্যান্ড ফোন কিংবা মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট, ক্যালকুলেটর, ক্যামেরা ইত্যাদি।

হার্ডওয়ার

১.১.২ তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতা

তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতা কি সে বিষয়ে আলোচনা করার আগে সাক্ষরতা কি তা আলোচনা করা যাক। এক কথায় সাক্ষরতা হলো কোন বিষয়ের অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা যা তাকে বুঝে পড়তে, সাধারণ ভাষায় লিখতে এবং দৈনন্দিন জীবনের হিসাব নিকাশ করতে সহায়তা করে। এটি নানা প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে অর্জিত হয়। শুধু তাই নয়, এই দক্ষতা বা অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করার ক্ষমতাকে সেই বিষয়ের সাক্ষরতা বলে অভিহিত করা যায়। এখন দৃষ্টি দেয়া যাক তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতা কী সে দিকে। তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতা হলো তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান বা দক্ষতা যা ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজন মিটায়। বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলা যায় যে, বর্তমান সমাজে যে সকল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি রয়েছে যেমন কম্পিউটার, মোবাইল, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি ব্যক্তি বা সমাজিক জীবনে ব্যবহারের ক্ষমতা বা দক্ষতাই হলো তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতা। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে একজন ব্যক্তির নিকট একটি মোবাইল ফোন দেয়া হলো কিন্তু ঐ ব্যক্তির মোবাইল সম্পর্কে কোন ধারণা বা জ্ঞান নেই ফলে তিনি এটি ব্যবহার করতে পারলেন না। তাহলে ঐ ব্যক্তি মোবাইল বিষয়ে নিরক্ষর।

যদি ঐ ব্যক্তির মোবাইল বিষয়ে জ্ঞান থাকতো বা তিনি এটিকে ব্যবহার করতে পারতেন তাহলে তার মোবাইল বিষয়ে সাক্ষরতা রয়েছে একথা বলা যেত। এমনিভাবে তথ্য প্রযুক্তির অন্যান্য যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

আজকের যুগে কোন ব্যক্তি যদি তথ্য কোথায় পাওয়া যায় তা চিহ্নিত (Identifying) করতে পারে, নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী খুঁজে বের করতে পারে (Locating), যে তথ্য তার দরকার সে টুকু ডাউনলোড করতে পারে (Downloading), প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পাদনার কাজ করতে পারে (Editing), প্রয়োজন অনুযায়ী আপলোড

করতে পারে (Uploading), তথ্য সংরক্ষণ (Preserving) করতে পারে, পক্রিয়াকরণ (Proccesing) করতে পারে, ব্যবহার ও পুন:ব্যবহার (Use and Re-use) করতে পারে, ডিজিটাল ডিভাইস (Digital divice) ব্যবহার করে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে তাহলে তাকে 'তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষর' বলা যায়।

১.১.৩ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

আধুনিক জীবন ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ছাড়া অচল প্রায়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ আজ প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়ছে। সভ্যতার ক্রমবর্ধমান বিকাশ এবং উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষার সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে। মূলত শিক্ষার ফলেই উদ্ভব হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির। আর শিক্ষা যেহেতু সকল উন্নয়ন এর কেন্দ্রবিন্দু সেক্ষেত্রে এখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে এবং শিক্ষার প্রায় সকল ক্ষেত্রে আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে।

শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সাধারণত দুই ভাবে হয়ে থাকে। প্রথমত বিষয়বস্তু হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আজ পাঠ্য হয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। অন্যদিকে শিক্ষা ব্যবস্থার অধুনিকিকরণ এবং পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্নে শিক্ষার যে সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

- শিক্ষা উপকরণ তৈরি এবং শ্রেণিতে ব্যবহার: শিক্ষার জন্য নানা ধরণের উপকরণ যেমন বই-পত্র, ডিজিটাল কনটেন্টসমূহ তৈরি এবং পাঠদান ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবহার: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা সহজ হয়েছে ।যেমন- পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রদান কার্যক্রমে এসেছে গতি।
- বিষয় হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পাঠ: বিভিন্ন স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আজ বিষয় হিসেবে পড়ানো হচ্ছে। যেমন- কম্পিউটার বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, টেলি কমিউনিকেশন ইত্যাদি।
- দূর শিক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে শ্রেণি কক্ষের ধারণা পাল্টে যেতে বসেছে। এখন এই প্রযুক্তির ফলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীকে একই ছাদের তলায় না বসেও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব এবং এটা হচ্ছে দেশে এবং বিদেশে। শিক্ষক তার নিজ স্থান থেকে আলোচনা করছেন আর শিক্ষার্থী শত মাইল দূরে তার ঘরে বসেই সেই আলোচনা বা ক্লাস করতে পারছেন।

- শিক্ষক হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: অনেক ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আজ শিক্ষকের ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষার্থী তার যে কোন প্রশ্নের উত্তরের জন্য ঘরে বসেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (অন্তর্জাল বা ইন্টারনেট) এর মাধ্যমে উত্তর বা সমাধান পেতে পারেন।
- জ্ঞানের আধার বা লাইব্রেরি হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: এক সময় ছিলো যখন মানুষ জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষকের নিকট ও লাইব্রেরিতে যেতেন। এখন শিক্ষক এবং লাইব্রেরি উভয় ক্ষেত্র দখল করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। ইন্টারনেট বা অন্তর্জালের দুনিয়ায় সার্চ দিলে সব ধরণের বই বা তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে তথ্য ও জ্ঞান ভান্ডারের উৎস বা লাইব্রেরি বলা যেতে পারে।

সর্বোপরি বলা যায় যে, শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জন ও চর্চার সকল ক্ষেত্রেই আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে।

১.১.৪ কম্পিউটার পরিচিতি- কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার

কম্পিউটারের সংগঠনের ভাগগুলো হচ্ছে এ রকম- প্রথমত কম্পিউটারের দুটি ভাগ: হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার। হার্ডওয়্যারের চারটি অংশ: সিপিইউ, মেমোরি, ইনপুট ও আউটপুট ।

সিপিইউ

কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ভাগের প্রধান অংশ কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বা সিপিইউ। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটকে মাইক্রোপ্রসেসর হিসেবেও অভিহিত করা হয়। ব্যবহারকারীর নির্দেশ অনুযায়ী কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে সকল কাজের প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়। কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে ব্যবহারকারীর নির্দেশ পৌঁছার পর ঐ নির্দেশ অনুযায়ী অস্থায়ী স্মৃতিতে অপেক্ষমাণ তথ্য/উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর তথ্য/উপাত্ত এবং নির্দেশ হচ্ছে ইনপুট। প্রক্রিয়াকরণের কাজ চলার সময় কাজের পর্যায় বা অগ্রগতি কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত মনিটরে প্রদর্শিত হয়। মনিটরে কাজের হাল অবস্থা প্রদর্শন হচ্ছে আউটপুট। এ ছাড়া, ব্যবহারকারীর নির্দেশ প্রদান করলে মনিটরের পর্দায় প্রদর্শিত ফল কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত প্রিন্টারে মুদ্রণের জন্য প্রেরিত হয়। প্রিন্টারে মুদ্রন নেওয়ার কাজটিও আউটপুট।

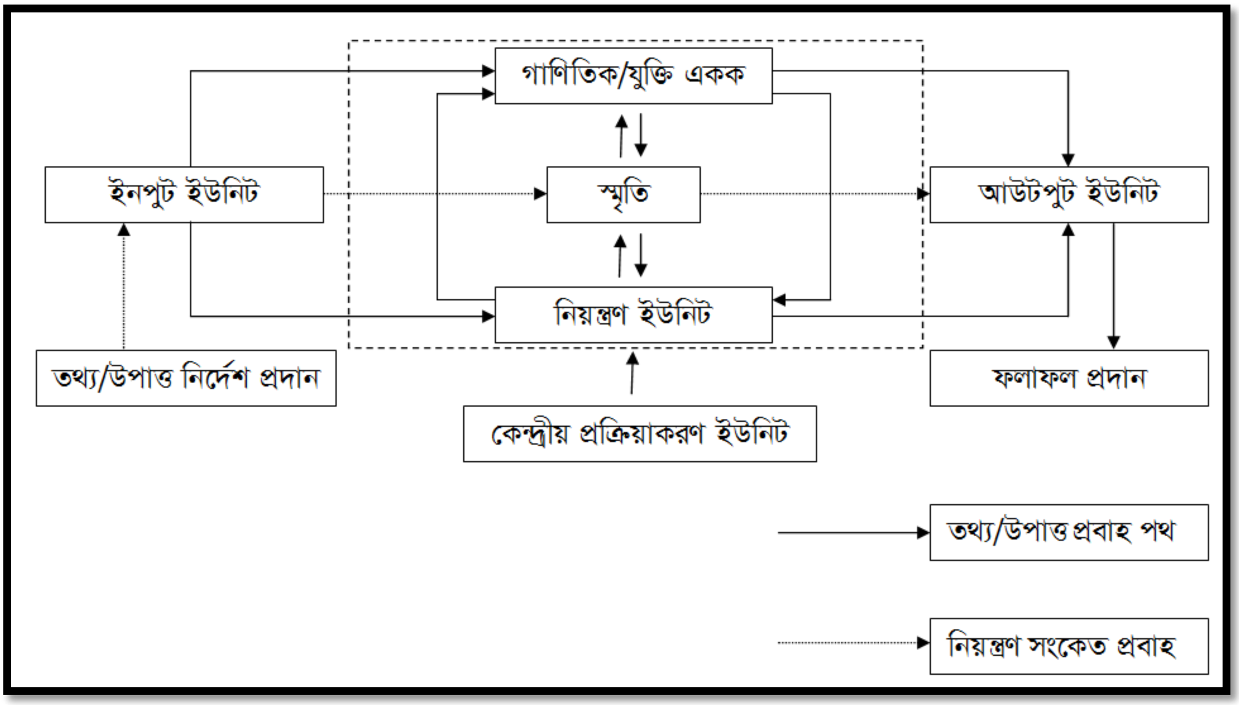

চিত্র: কম্পিউটারের সংগঠন

কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে- কম্পিউটারের মেমোরিতে সঞ্চিত প্রোগ্রাম নির্বাহ করা, গাণিতিক যুক্তির কাজ করা, মেমোরি ও গাণিতিক যুক্তি অংশের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করা এবং অন্যান্য অংশের সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদানের কাজ নিয়ন্ত্রণ করা, ইনপুট এবং আউটপুট অংশগুলোর সঙ্গে কাজের সমন্বয় বিধান করা ইত্যাদি। বর্তমানে মাইক্রোপ্রসেসরই হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট। এসব কাজের জন্য মাইক্রোপ্রসেসরের ভেতরে প্রয়োজনীয় সার্কিট থাকে। মাইক্রোপ্রসেসরের ভেতরের সংগঠনকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ক. নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (Control Unit) এবং খ. গাণিতিক যুক্তি ইউনিট (Arithmatic Logic Unit) গ. স্মৃতি (Memory)

ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস

কম্পিউটারের সাহায্যে কোন কাজ করার জন্য প্রথমে কম্পিউটারকে ঐ কাজের তথ্য প্রদান করতে হয়। কম্পিউটারে ইনপুট প্রদানের জন্য অনেক রকম যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এসব যন্ত্রকে বলা হয় ইনপুট ডিভাইস (Input Device)। ইনপুট ডিভাইসের সাহায্যে প্রেরিত তথ্য বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে কম্পিউটারের র‍্যামে যায় এবং সেখানে কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষায় প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন হয়।

বহুল ব্যবহৃত ইনপুট যন্ত্রাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কীবোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, গ্রাফিক্স ট্যাবলেট, ওসিআর, ওএমআর, ডিজিটাল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা ইত্যাদি।

প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে ফল পাওয়া যায় সে সকল যন্ত্রকে আউটপুট ডিভাইস বলা হয়। বহুল ব্যবহৃত আউটপুট যন্ত্রাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মনিটর, বিভিন্ন প্রকারের প্রিন্টার, স্পীকার এলসিডি প্যানেল ও ভিডিও প্রজেক্টর ইত্যাদি।

সফটওয়্যারের ধারণা

হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের সমন্বয়ে গঠিত হয় কম্পিউটার সিস্টেম। হার্ডওয়্যারকে সচল ও কাজের লক্ষ্যে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন সফটওয়্যার (Software)। সফটওয়্যার ছাড়া শুধু হার্ডওয়্যার নিষ্প্রাণ দেহের মত। এই নিষ্প্রাণ দেহে প্রাণ সঞ্চার করে সফটওয়্যার।

সফটওয়্যার প্রধানত দুই প্রকার। যেমন- অপারেটিং সিস্টেম বা সিস্টেম সফটওয়্যার (Operating System/System Software) এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Program)।

অপারেটিং সিস্টেম

অপারেটিং সিস্টেম (Operating System) কে সিস্টেম সফটওয়্যার হিসেবেও অভিহিত করা হয়। অপারেটিং সিস্টেম বা সিস্টেম সফটওয়্যার ছাড়া কম্পিউটার চলতে পারে না। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজগুলো পরিচালনা করে অপারেটিং সিস্টেম। অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকশন প্রোগ্রামের মাঝখানে অবস্থান করে। বর্তমানে পিসির জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে উইন্ডোজ সেভেন, উইন্ডোজ এইট ও উইন্ডোজ টেন। এছাড়া কেউ কেউ ম্যাক ওএস ও লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের বিভিন্ন ভার্সনও ব্যবহার করে থাকেন।

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের প্রকারভেদ

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম (Application Program) বা ব্যবহারকারীর সফটওয়ার বা প্রোগ্রাম হিসেবে অভিহিত করা হয়। অ্যাপ্লিকশন সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকশন প্রোগ্রাম হচ্ছে কাজ করার উপকরণ বা অবলম্বন। যেমন- লেখার জন্য কলম, ছবি আঁকার জন্য রং-তুলি এবং নকশা করার জন্য কাঁটা-কম্পাস, স্কেল, পেন্সিল ইত্যাদি হচ্ছে অপরিহার্য উপকরণ বা অবলম্বন। এর একটি দিয়ে অন্যটির কাজ চলে না। প্রত্যেকটি কাজের ধরন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। ঠিক তেমনিভাবে কম্পিউটারের সাহায্যে একেক

ধরনের কাজের জন্য একেক ধরনের অ্যাপ্লিকশন প্রোগ্রাম বা সফটওয়ারের প্রয়োজন হয়। যেমন ডকুমেন্ট সম্পাদনার জন্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, ছবি এডিটের জন্য অ্যাডোবি ফটোশপ ইত্যাদি।

১.১.৫ কম্পিউটার চালু ও বন্ধকরণ, ফোল্ডার ও ফাইল খোলা ও ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম খোলা, মেমোরি ডিভাইসে তথ্য সংরক্ষণ কৌশল

কম্পিউটার চালু ও বন্ধকরণ

কম্পিউটার চালু করার আগে দেখে নিতে হবে কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত লাইন যথাযথ আছে কিনা। এ জন্য নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রম অনুসরণ করতে হবে-

- পাওয়ার সাপ্লাই এর সুইচ অন করতে হবে
- ইউপিএস (যদি থাকে) এর সুইচ অন করতে হবে
- কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ অন করতে হবে
- মনিটরের পাওয়ার সুইচ অন করতে হবে
- অনেক সময় মনিটর কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিট থেকে পাওয়ার নিয়ে থাকে। এমতাবস্থায় কম্পিউটারের পাওয়ার সুইচ অন করলেই মনিটরটির পাওয়ার এসে যায়। দেখা যায় পাওয়ার সুইচ অন করার পর কম্পিউটারের সাথে যুক্ত কীবোর্ড এ কম্পিউটারের বা সিস্টেমের লেড বা মনিটরের লেড বোতামে সবুজ জাতীয় আলো প্রদর্শিত হচ্ছে
- কম্পিউটারের সাথে এক্সটারনাল মডেম বা প্রিন্টার থাকলে এবং তা ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে তার পাওয়ার সুইচও অন করতে হবে

কম্পিউটার বন্ধ করার জন্য নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রম অনুসরন করতে হবে ।

- স্টার্ট মেনু থেকে টার্ন অফ কম্পিউটার (Turn Off Computer) সিলেক্ট করলে টার্ন অফ কম্পিউটার ডায়লগ বক্স আসবে
- ডায়লগ বক্সে-
    - টার্ন অফ (Turn Off) বোতামে ক্লিক করলে কম্পিউটার বন্ধ হয়ে যাবে
    - রিস্টার্ট (Restart) বোতামে ক্লিক করলে কম্পিউটার বন্ধ হয়ে পুনরায় চালু হবে

- ক্যান্সেল (Cancel) বোতামে ক্লিক করলে কম্পিউটার বন্ধ না হয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যাবে

কম্পিউটার পুরোপুরি বন্ধ হলে পাওয়ার সাপ্লাই, ইউপিএস ও মনিটরের পাওয়ার বাটন বন্ধ (Off) করতে হবে

ফোল্ডার ও ফাইল খোলা ও ব্যবস্থাপনা

ফোল্ডার

অফিস-আদালতে ব্যবহৃত ফাইল কেবিনেটকে যদি হার্ডডিস্ক ধরা হয় তবে এর প্রতিটি ড্রয়ার হচ্ছে একেকটি ফোল্ডার। ফোল্ডারে ফাইল সংরক্ষণ করে রাখা হয় এবং ফোল্ডার নামকরণের মাধ্যমে সহজেই কোন্ ফোল্ডারে কোন ফাইলটি রাখা হয়েছে তা খুঁজে বের করা যায়।

ডেস্কটপে বা যেকোন ড্রাইভে ফোল্ডার তৈরি করা

কাজ শুরু করার আগেই নির্দিষ্ট নামে ফোল্ডার তৈরি করে নেওয়া যায়। ফোল্ডার তৈরি করার জন্য নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রম অনুসরন করতে হবে।

- ডেস্কটপের উপরে (বা নির্দিষ্ট ড্রাইভে গিয়ে) মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে ক্লিক করলে একটি মেনু পাওয়া যাবে।
- উক্ত মেনু থেকে নিউ (New) সিলেক্ট করলে আর একটি সাবমেনু আসবে
- সাবমেনু থেকে ফোল্ডার (Folder) সিলেক্ট করতে হবে
    - এ পর্যায়ে ডেস্কটপের উপর একটি ফোল্ডার আইকন আসবে এবং আইকনের নিচে নিউ ফোল্ডার (New Folder) লেখাটি সিলেক্টেড অবস্থায় থাকবে
- ফোল্ডারের জন্য যথাযথ একটি নাম টাইপ করে এন্টার বোতাম চাপতে হবে

ফাইল

একটি খোলা কাগজের উপর লেখা থাকতে পারে, ছবি থাকতে পারে, হিসাব নিকাশের কাজ থাকতে পারে। এ ধরনের কোন কাজ করার পর আবার সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্য এগুলো একেকটি নাম দিয়ে রাখতে হয়। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন নামে গুছিয়ে রাখা একেকটি কাজকে বলা হয় ফাইল।

ডেস্কটপে ফাইল তৈরি করা

ডেস্কটপে ফাইল তৈরি করার জন্য নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রম অনুসরন করতে হবে।

- ডেস্কটপের উপর মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে ক্লিক করলে একটি মেনু পাওয়া যাবে
- উক্ত মেনু থেকে নিউ (New) সিলেক্ট করলে আর একটি সাবমেনু আসবে
- ফাইল তৈরি করার জন্য সাবমেনু থেকে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যেমন মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০০৩/এক্সপি/২০০৭/২০১০/২০১৩/২০১৬ সিলেক্ট করতে হবে
- এ পর্যায়ে ডেস্কটপের উপর উক্ত সফটওয়্যারের আইকন আসবে এবং ফাইলের জন্য যথাযথ একটি নাম টাইপ করে এন্টার বোতাম চাপতে হবে

এক ফোল্ডার থেকে অন্য ফোল্ডারে ফাইল/ ফোল্ডার কপি করা

এক ফোল্ডার থেকে অন্য ফোল্ডারে ফাইল/ফোল্ডার কপি করার জন্য নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রম অনুসরন করতে হবে।

১. যে ফোল্ডার থেকে ফাইল কপি করতে হবে এবং যে ফোল্ডারে স্থানান্তরিত করতে হবে সেই দুটি ফোল্ডার খুলতে হবে।

২. যে ফাইলটি কপি করতে হবে সেই ফাইলটি সিলেক্ট করার পর টেনে নিয়ে (Dragকরে) গন্তব্য ফোল্ডারে নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে (Drop করতে হবে)।

অথবা,

- ফাইলটি সিলেক্ট করার পর মাউসের ডান বোতামে চাপ দিলে একটি মেনু আসবে। উক্ত মেনু থেকে কপি কমান্ড সিলেক্ট করতে হবে।
- যে ফোল্ডারে স্থানান্তরিত করতে হবে সেই ফোল্ডারের ভেতরে মাউসের ডান বোতামে চাপ দিলে একটি মেনু আসবে। উক্ত মেনু থেকে পেস্ট কমান্ড সিলেক্ট করলে কপি করা ফাইলটি গন্তব্য ফোল্ডারে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।

ডেস্কটপ থেকে ফোল্ডার/ ফাইল মুছে ফেলা

ডেস্কটপ থেকে ফোল্ডার/ফাইল মুছে ফেলার জন্য নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রম অনুসরন করতে হবে।

১. মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে নির্দিষ্ট ফাইল বা ফোল্ডারটি সিলেক্ট করলে একটি মেনু আসবে।

২. উক্ত মেনু থেকে ডিলিট কমান্ড সিলেক্ট করলে ফাইল/ফোল্ডারটি বাতিল হয়ে যাবে।

অথবা

রিসাইকেল বিনের মাধ্যমে ফাইল বা ফোল্ডার ফেলে দেওয়ার জন্য ঐ ফাইল বা ফোল্ডারে ক্লিক ও Drag করে রিসাইকেল বিন আইকনের উপর নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে (Drop করতে হবে)। এতে ঐ ফাইল বা ফোল্ডারটি রিসাইকেল বিনের ভেতরে অবস্থান করবে।

ফাইল বা ফোল্ডার স্থায়ীভাবে মুছে ফেলা

ফাইল বা ফোল্ডার স্থায়ীভাবে মুছে ফেলার জন্য নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রম অনুসরন করতে হবে।

১. রিসাইকেল বিনের আইকনের উপর মাউসের ডান বোতামে চাপ দিয়ে সিলেক্ট করলে মেনু পাওয়া যাবে।

২. উক্ত মেনু থেকে এম্পটি রিসাইকেল বিন (Empty Recycle Bin) কমান্ড সিলেক্ট করলে একটি সতর্কতাসূচক বার্তা বক্স আসবে।

৩. সতর্কতাসূচক বার্তা বক্সের হ্যাঁ সূচক বোতামে ক্লিক করলে রিসাইকেল বিনের ভেতরে জমে থাকা সকল ফাইল ফোল্ডার স্থায়ীভাবে মুছে যাবে বা Delete হয়ে যাবে।

মুছে ফেলা ফাইল/ফোল্ডার পুনরুদ্ধার করা

স্থায়ীভাবে মুছে ফেলার আগে রিসাইকেল বিনে অবস্থিত ফাইল বা ফোল্ডার পুনরুদ্ধার করা যায়। এ জন্য নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রম অনুসরন করতে হবে।

১. মুছে ফেলা ফাইলের তালিকা দেখার জন্য ডেস্কটপের রিসাইকেল বিন আইকনে ডবল ক্লিক করি।

২. পুনরুদ্ধারের জন্য কাঙ্ক্ষিত ফাইল/ফাইলগুলো সিলেক্ট করে মাউসের ডান বোতামে ক্লিক করে Restore কমান্ড সিলেক্ট করি। এতে ফাইল/ফাইলগুলো পূর্বের স্থানে ফিরে যাবে।

প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম খোলা

ধরা যাক, লেখালেখির কাজের জন্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রোগ্রাম খুলতে হবে। এ জন্য নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রম অনুসরন করতে হবে।

১. স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করে All Programs সিলেক্ট করি

২. All Programs থেকে মাইক্রোসফট অফিস ক্লিক করলে মাইক্রোসফট অফিস এর প্রোগ্রামগুলোর তালিকা পাওয়া যাবে

৩. এ তালিকা থেকে ওয়ার্ড প্রোসেসিং প্রোগ্রাম মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০১৩ এ ক্লিক করলে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০১৩ খুলে যাবে।

মেমোরি ডিভাইসে তথ্য সংরক্ষণ কৌশল

বিভিন্ন উপায়ে তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। যেমন-

- স্টোরেজ ডিভাইস, যেমন- হার্ড ড্রাইভ বা হার্ড ডিস্ক, এক্সটারনাল হার্ড ডিস্ক, পেন ড্রাইভ বা ফ্ল্যাশ ড্রাইভ, মেমোরি কার্ড, ডিভিডি ইত্যাদিতে সংরক্ষণ করা যায় ।
- ক্লাউডস্টোরেজ সার্ভিস, যেমন-গুগল ড্রাইভ, ড্রপবক্স, মেগা, ওয়ান ড্রাইভ, স্কাই ড্রাইভ, সুগার সিংক ইত্যাদিতে সংরক্ষণ করা যায়।

স্টোরেজ বা মেমোরি ডিভাইসে তথ্য সংরক্ষণ করার নিয়মাবলী

হার্ড ডিস্ক ড্রাইভে তথ্য সংরক্ষণ করার পদ্ধতি

উইন্ডোজ সেভেন ডেস্কটপ থেকে Computer ফোল্ডারটি ওপেন করি। কম্পিউটারের মনিটরে নিচের চিত্রের মত হার্ড ডিস্কের বিভিন্ন ড্রাইভ বা পার্টিশান দেখা যাবে। যেমন- Local Disk (C), New Volume (D), New Volume (E)।

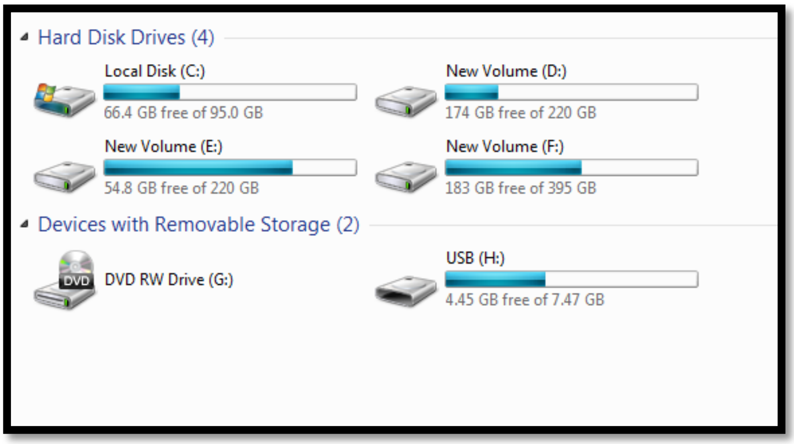

এই ড্রাইভগুলোর যেকোনটিতে ফাইল ও ফোল্ডার সংরক্ষন বা সেভ করার ধাপসমূহ-

১. যে ফাইলটি সেভ করা হবে তাকে মাউসের সাহায্যে সিলেক্ট করে Copy করি।

২. এবার ডেস্কটপে Computer আইকনে ডাবল ক্লিক করে পছন্দমত ড্রাইভে বিদ্যমান কোন ফোল্ডার খুলে বা নতুন কোন ফোল্ডার তৈরি করে Copy করা ফাইল বা ফোল্ডারটি Paste করি। এভাবে ফাইল বা ফোল্ডারটি হার্ডডিস্কে সংরক্ষণ বা সেভ করা যায়।

এছাড়াও যখন কোন ফাইল তৈরি করা হয় তখন Saveও Save As করার সময় পছন্দমত লোকেশন Select করে নিচের চিত্রের মত তা সেভ করতে পারি ।

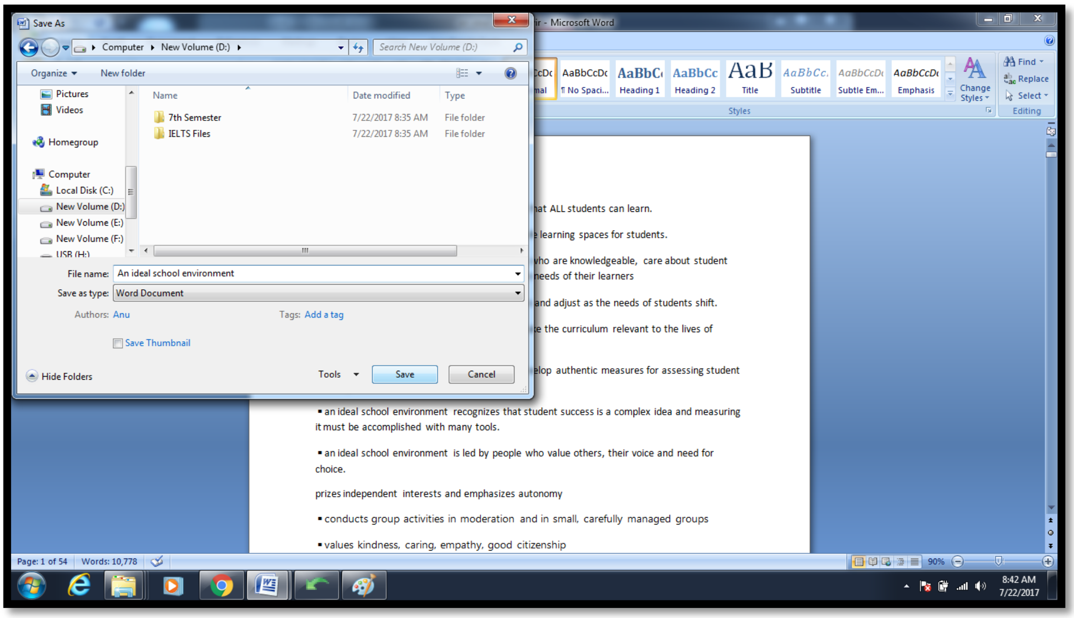

পেন ড্রাইভ বা ফ্ল্যাশ ড্রাইভে তথ্য সংরক্ষণ

পেন ড্রাইভে তথ্য সংরক্ষণ করার পদ্ধতি হার্ডডিস্কের অন্যান্য ড্রাইভে তথ্য সংরক্ষণ করার মতই।

১. যে ফাইলটি সেভ করব সেটি Select করে Copy করি

২. এবার My Computer এ ডাবল ক্লিক করে USB/পেনড্রাইভ আইকনটিতে ডাবল ক্লিক করি।

৩. এখন USB/পেনড্রাইভ এর খোলা উইন্ডোতে কপি করা ফাইলটি পেস্ট করি। এভাবে পেন ড্রাইভ বা ফ্ল্যাশ ড্রাইভে তথ্য সংরক্ষণ করা যায়।

উল্লেখ্য: এক্সটার্নাল বা পোর্টেবল হার্ড ডিস্কেও উপরের নিয়মে তথ্য সংরক্ষণ করা যায়।

সিডি/ ডিভিডিতে তথ্য সংরক্ষণ

চিত্রে লক্ষ করলে DVD RW Drive নামে আইকনটি দেখা যাবে। এই আইকনটি দ্বারা বুঝা যায় যে কম্পিউটারে ডিভিডি ড্রাইভ আছে। কোন তথ্য ডিভিডিতে সেভ বা Write করতে হলে কম্পিউটারে অবশ্যই ডাটা Write করার সুবিধাযুক্ত ডিভিডি ড্রাইভ থাকতে হবে।

ডিভিডি ড্রাইভে তথ্য সংরক্ষণ করার পদ্ধতি

১. ডিভিডি ড্রাইভে নতুন ডিভিডি (Blank DVD) ইনসার্ট করি।

২. যে ফাইলটি সেভ বা Write করব সেটি Select করে Copy করি।

৩. এবার Computer Icon এ ডাবল ক্লিক করে সেখানে DVD RW Drive নামে যে আইকনটি আছে সেটি ডাবল ক্লিক করি।

৪. এখন DVDRW Drive এর খোলা উইন্ডোতে কপি করা ফাইলটি পেস্ট করি। এভাবে ডিভিডি ড্রাইভে তথ্য সংরক্ষণ করা যায়।

ক্লাউড স্টোরেজ সার্ভিসের সাহায্যে তথ্য সংরক্ষণ

বর্তমানে তথ্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্টোরেজ সার্ভিসের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের সার্ভিস ব্যবহারের জন্য অবশ্যই ইন্টারনেটের কানেকশন থাকতে হবে। এগুলোকে সাধারণভাবে ক্লাউড স্টোরেজ বলে। বিভিন্ন ক্লাউড স্টোরেজ সার্ভিস, যেমন-গুগল ড্রাইভ, ড্রপবক্স, স্কাই ড্রাইভ, সুগার সিংক ইত্যাদি বর্তমানে আমাদের আধুনিক, চলমান জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এধরনের সার্ভিসে সাইন (Sign up) আপের মাধ্যমে এই সেবা গ্রহণ করা যায়। সাইন আপের সাথে সাথে অনলাইনে স্পেস নির্ধারিত হয়ে যায় এবং সেখানে ফাইলগুলো সংরক্ষণ করা যায়। এতে ডিজিটাল ডাটা শুধু কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক, মোবাইলের মেমোরি কার্ড, পেন ড্রাইভ, ডিভিডি ইত্যাদি স্টোরেজ ডিভাইসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং ইন্টারনেট কানেকশনযুক্ত কম্পিউটারে ক্লাউড স্টোরেজ সার্ভিসের সাহায্যে তথ্যগুলো যেকোন সময় যেকোন জায়গায় পুনরুদ্ধার ও ব্যবহার করা যায়। এই ধরনের সার্ভিস ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের সাথে সাথে প্রয়োজনে শেয়ারও করা যায়।

১.২ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে মৌলিক দক্ষতাঃ ওয়ার্ড প্রসেসিং (Word Processing: Microsoft Word)

মাইক্রোসফট করপোরেশন দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য ব্যবহারবান্ধব কতগুলো প্রোগাম একটি প্যাকেজে বাজারজাত করে। এটি হলো মাইক্রোসফট অফিস। মাইক্রোসফট অফিস এর মধ্যে কয়েকটি অ্যাপ্লিকেশন হলো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট, মাইক্রোসফট এক্সেল ও মাইক্রোসফট এক্সেস।

Microsoft Word সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে আমরা ওয়ার্ড প্রসেস করতে পারি। অর্থাৎ এর মাধ্যমে বিভিন্ন ডকুমেন্ট যেমন আবেদনপত্র, বই, প্রতিবেদন ইত্যাদি কম্পোজ বা টাইপ করে ছাপানোর উপযোগী করা যায়। এ সফটওয়্যার বা প্রোগ্রামটি ব্যবহার করে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার মতো বাংলা ভাষায়ও ওয়ার্ড প্রসেস করা যায়। এটি সারা বিশ্বে ব্যক্তিগত, অফিসিয়াল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি তৈরি করার জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটি ব্যবহার করে আমরা পাঠ পরিকল্পনা, প্রতিবেদন, আবেদনপত্র ইত্যাদি প্রস্তুত করতে পারবো।

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রোগ্রামটির বিভিন্ন ভার্সন যেমন– মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ৯৭,২০০৩, ২০০৭, ২০১০, ২০১৩,২০১৬ ইত্যাদি প্রচলিত রয়েছে। আমরা এ পর্যায়ে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ২০১০ ভার্সনটি নিয়ে কাজ করব।

১.২.১ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর কাজ এর তালিকা

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রোগ্রামটি ব্যবহার করে আমরা ডকুমেন্ট তৈরির নানারকম কাজ করার সুযোগ পাই। নিম্নে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর কিছু সংখ্যক কাজের বিবরণ প্রদান করা হলো।

- ওয়ার্ড ডকুমেন্ট কম্পোজ করা
- ওয়ার্ড ডকুমেন্ট এডিট করা

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রোগ্রামটি চালানো

নিম্নে প্রদত্ত পর্যায়ক্রম অনুসরন করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রোগ্রামটি চালানো যায়:

পদ্ধতি: ১

- স্টার্টমেনুতে ক্লিক করি।
- সেখান থেকে All Programs মেনুতে ক্লিক করলে প্রোগ্রামসমূহের একটি তালিকা আসবে
- তালিকা থেকে খুব সহজেই আমরা Microsoft officeএর ফোল্ডারটি ক্লিক করি এবং Microsoft Word ২০১০(নিচের চিত্র লক্ষ্য করি) সিলেক্ট করি।

- সিলেক্ট করার পর Enter (এন্টার) চাপ দিয়ে প্রোগ্রামটি চালানো যায়। নিচের চিত্রের ন্যায় কম্পিউটারের পর্দায় এমএস ওয়ার্ড ২০১০ এর উইন্ডোটি চলে আসবে। এই উইন্ডোতে ওয়ার্ড প্রসেস করব। ওয়ার্ড উইন্ডোর উপর বাংলা দাঁড়ি (।) চিহ্নের মতো একটি চিহ্ন ব্লিঙক বা টিপ টিপ করতে দেখছি। এটা হলো কার্সর (Cursor)।

- কার্সরের অবস্থান থেকেই লেখা বা ডাটা টাইপ করতে পারি। কার্সরটিকে ডানে বামে উপরে নিচে সরানো যায়। অ্যারো কী (রাইট →, লেফট ←, আপ ↑, ডাউন ↓ অ্যারো) অথবা ট্যাব বোতাম ব্যবহার করে এটা করতে পারি। লেখা বা ডাটা টাইপ করার সময় অন্য লাইনে অর্থাৎ নিচের লাইনে কার্সরটিকে নেয়ার জন্য এন্টার বোতাম চাপতে পারি।

স্ট্যাটাস বারে (-) ক্লিক করলে স্ক্রিন ভিউ ছোট হবে আর (+) ক্লিক করলে স্ক্রিন ভিউ বড় হবে । ব্যবহারিক কাজের সময় সুবিধাটি চর্চা করবো।

রুলার বা স্কেল ব্যবহার করে ডুকমেন্টে নির্দিষ্ট দুরত্বে কোন টেক্সট বা অবজেক্ট স্থাপন করা যায়। যেমন- একটি টেক্সট ৩ ইঞ্চি দূরত্বে স্থাপন করতে হবে। তাহলে রুলার/স্কেলটির ৩ ইঞ্চি চিহ্নিত বিন্দুতে ক্লিক করলে একটি (L) ট্যাব স্থাপিত হবে। এবার ট্যাব বাটন চাপলে টেক্সটসহ কার্সরটি ঠিক ৩ ইঞ্চি দূরে অবস্থান করবে।

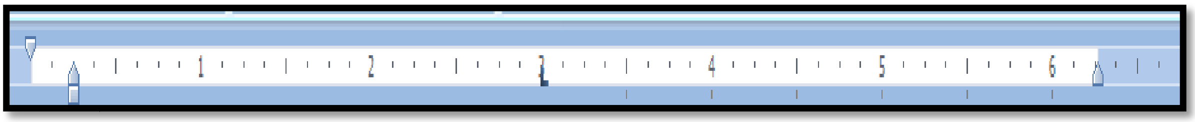

১.২.২ ডকুমেন্ট খোলা ও সেভ করা

মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে নতুন ডকুমেন্ট খোলা

মাউস ক্লিক করে

- ওয়ার্ড উইন্ডোর উপরে বাম কর্নারে অফিস বাটনটি রয়েছে। অফিস বাটনটিতে ক্লিক করি। এরপর New বাটনটিতে ক্লিক করি অথবা Ctrl+N চাপি
- একটি নতুন ওয়ার্ড ডুকমেন্ট তৈরি হবে

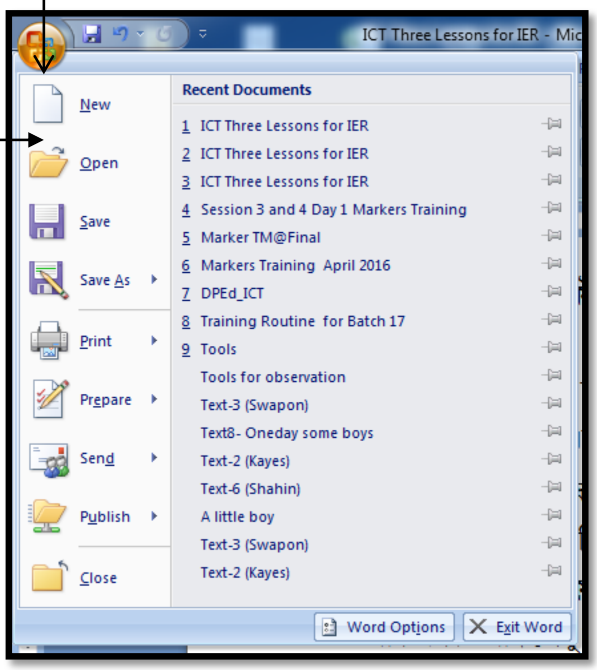

অথবা

ডেস্কটপে মাউসের ডান বোতামে ক্লিক করি। পাশের চিত্রের ন্যায় একটি সাব মেনু আসবে। ডান পাশের সাব মেনুর Microsoft Office Word Document এ ক্লিক করুন। একটি নতুন ওয়ার্ড ডুকমেন্ট তৈরি হবে।

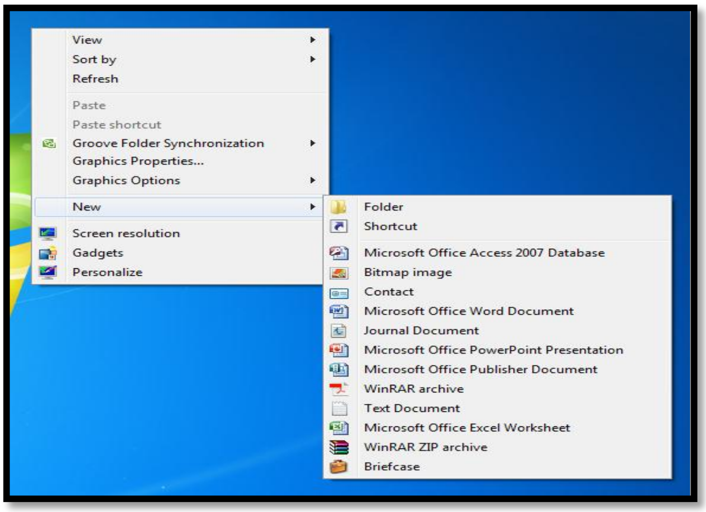

মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ডকুমেন্ট সেভ করা

- ✓ মেনু বারের উপরের বারটি হলো টাইটেল বার। এই টাইটেল বারের সর্ব বামে ফ্লপি ডিস্কের 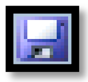 আইকনটিতে ক্লিক করি।
- ✓ নিচের চিত্রের মতো একটি ডায়লগ বক্স আসবে এবং ডায়লগ বক্সে ফাইলটির নাম টাইপ করি।
- ✓ এরপর সেভ (Save) বোতামে ক্লিক করলে ফাইলটি সেভ হয়ে যাবে।

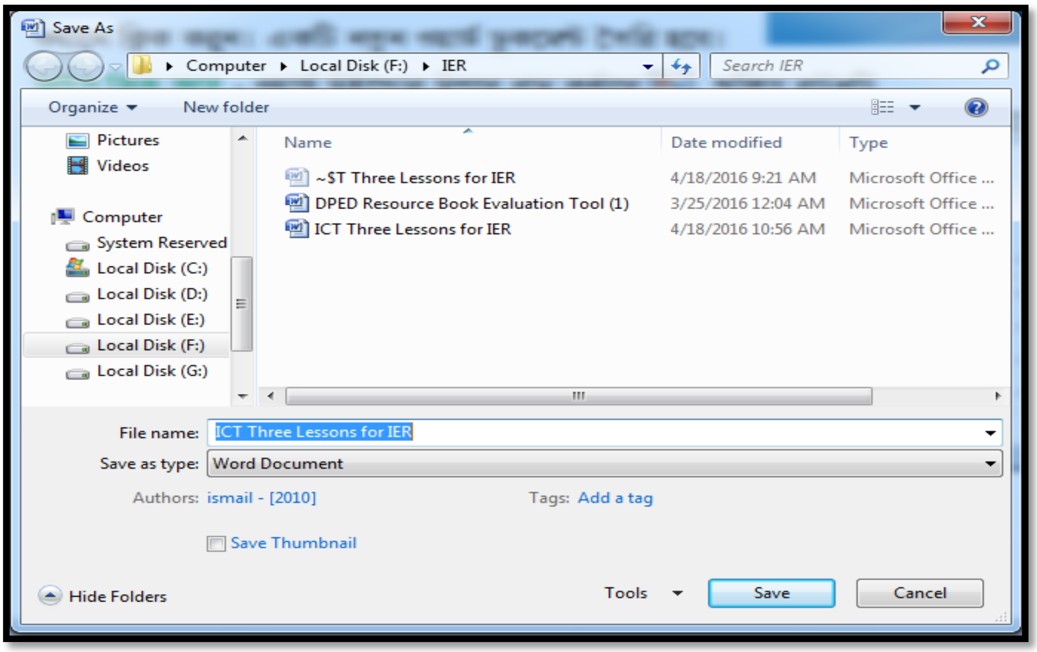

অথবা

কী বোর্ডে Ctrl+S চাপি। নিচের চিত্রের মতো ডায়লগ বক্স আসবে। ডায়লগ বক্সে ফাইলটির একটি নাম টাইপ করি এবং Save বোতামে ক্লিক করে ফাইলটি সেভ করি।

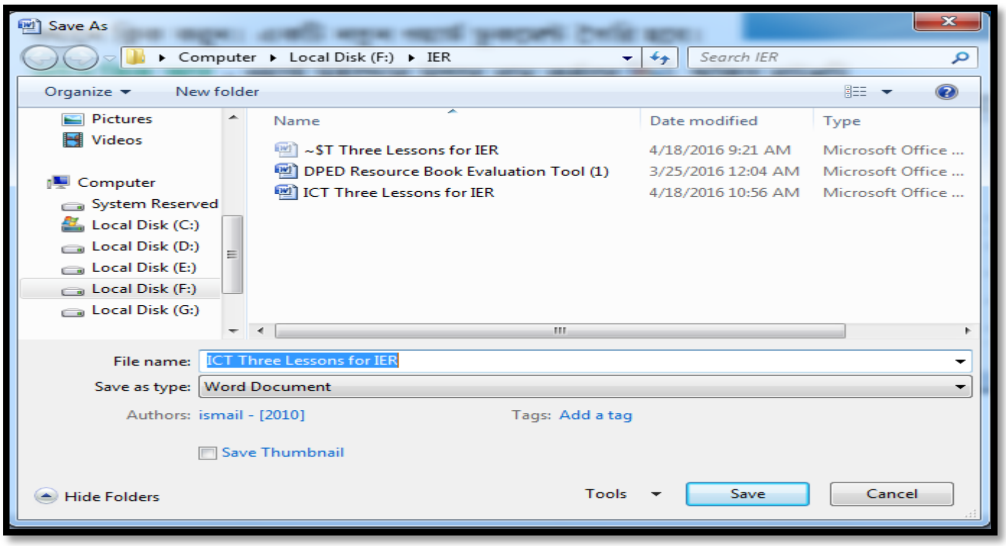

- **ফাইলের নামকরণ**

  ফাইলের নামকরণে যে কোন অক্ষর, সংখ্যা, হাইফেন ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে। ফাইলো কি ধরণের তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে নামকরণ করলে পরবর্তীতে সহজে উক্ত ফাইলটি খুঁজে পাওয়া যায়।

১.২.৩ টেক্সট কম্পোজ, সম্পাদনা ও ফরমেটিং

টেক্সট কম্পোজ

কী বোর্ডের বিভিন্ন প্রকার বাটন ব্যবহার করে আমরা আমাদের চাহিদামত কম্পোজ করতে পারি। বিভিন্ন বাটনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে দেওয়া হলো। যেমন-

- আলফাবেটিক বা টেক্সট কী: A, B, C,…….Z;
  a, b,c………..z
- নিউমারিক কী: 0, 1,2 9
- ফাংশন কী : F1, F2, F3…………..F12
- রিলেশনাল কী : <,>, =,
- গাণিতিক প্রকিয়া চিহ্নের কী: +, -, *, /
- যতি চিহ্ন কী:, . ’ ” ; : , ? ! ‘ ইত্যাদি
- কন্টোল বা অপারেশনাল কী: Enter, Shift, Ctrl, Alt, Delete, Backspace, Tab, Spacebar, Page Down, Page Up, Home, End, Insert, Caps lock, Esc

টেক্সট কম্পোজে দ্রুতগতি আনার জন্য আমরা বিভিন্ন টাইপিং সফটওয়ারের সহায়তা নিতে পারি।

সম্পাদনা

ডাটা কম্পোজ করার পর ডাটা বা ডকুমেন্ট সম্পাদনার কাজ করা যায়।

টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট (Text Alignment)

হোম ট্যাবের আওতাভুক্ত প্যারাগ্রাফ এর মধ্যে বিদ্যমান অ্যালাইনমেন্ট অপশনের মাধ্যমে লিখিত টেক্সটকে Left/Right/Center/Justify আকারে সাজানো যায়।

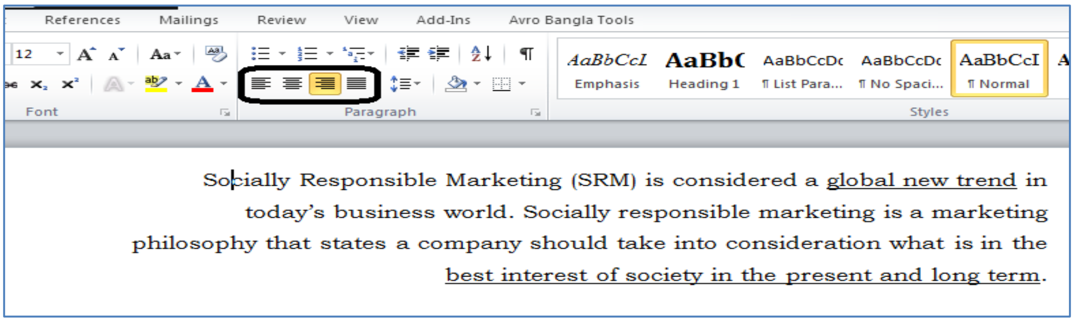

ফন্ট সাইজ পরিবর্তন (To change the font size)

হোম ট্যাবের আওতাভুক্ত ফন্ট অপশনের মধ্যে বিদ্যমান font size এর মাধ্যমে লিখিত টেক্সটের আকার পরিবর্তন করতে পারি।

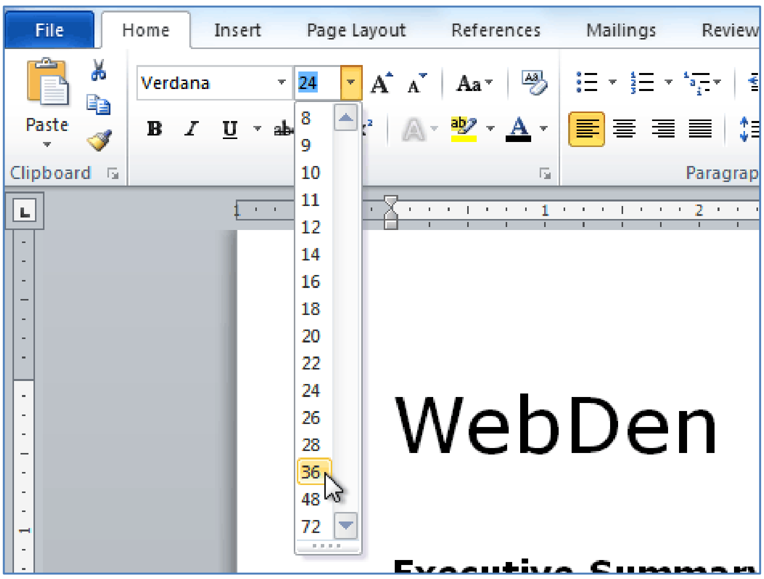

ফন্ট পরিবর্তন (To change the font)

হোম ট্যাবের আওতাভুক্ত ফন্ট অপশনের মাধ্যমে লিখিত টেক্সটের ফন্ট পরিবর্তন করতে পারি।

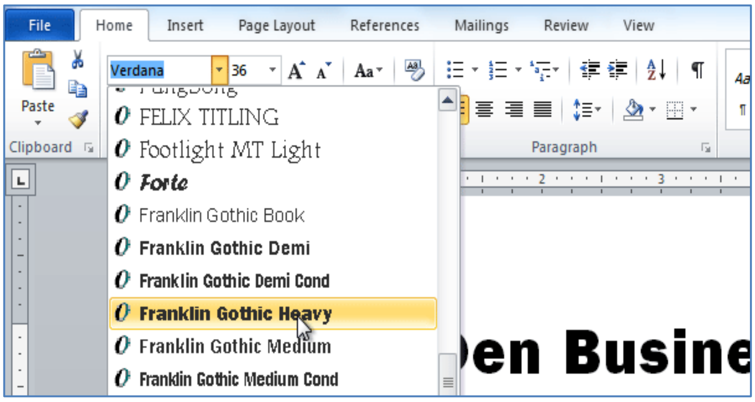

ফন্টের রঙ পরিবর্তন (To change the font color)

হোম ট্যাবের আওতাভুক্ত ফন্ট অপশনের মধ্যে বিদ্যমান font color এর মাধ্যমে লিখিত টেক্সটের রঙ পরিবর্তন করতে পারি।

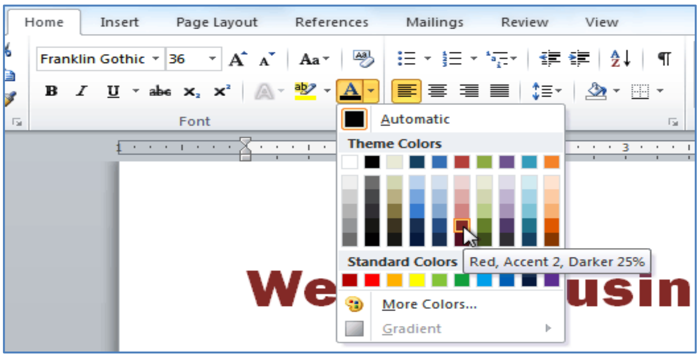

টেক্সট হাইলাইট করা (To highlight text)

হোম ট্যাবের আওতাভুক্ত ফন্ট অপশনের মধ্যে বিদ্যমান text highlight color এর মাধ্যমে লিখিত টেক্সট হাইলাইট করতে পারি।

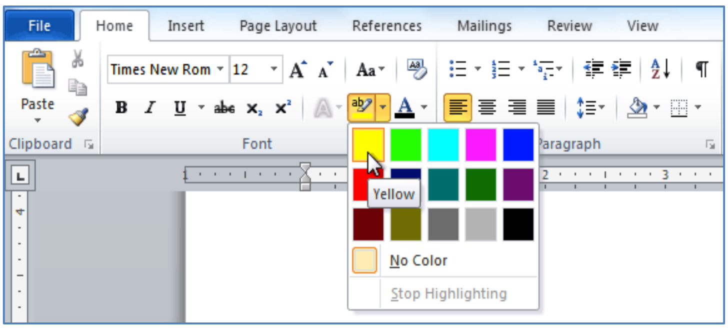

১.২.৪ টেবিল, ছবি, শেপ বা আকৃতি, পৃষ্ঠা নম্বর ইত্যাদি ইনসার্ট ও এডিট করা

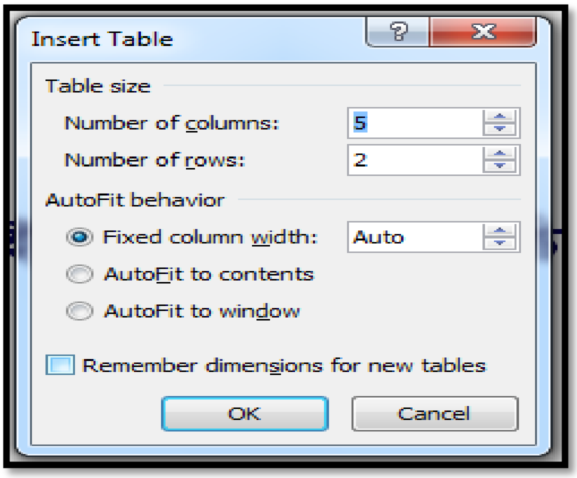

Creating Table (টেবিল বা ছক তৈরি করা)

- একটি টেবিল বা ছক তৈরি করতে হলে আমরা Insert মেনুতে ক্লিক করি।
- Table বাটনের ডাউন অ্যারো ক্লিক করি।
- Insert Table বাটনে ক্লিক করি।
- Sub Menu হিসাবে পাশের ডায়লগ বক্সটি আসবে।
- Number of columns: যতগুলো কলাম চাই তার সংখ্যা টাইপ করি।
- Number of rows: যতগুলো সারি বা রো চাই তার সংখ্যা টাইপ করি।
- এবার OK বাটন ক্লিক করলে টেবিল তৈরি হবে।

ডকুমেন্টে ছবি যুক্ত (Insert) করা

ডকুমেন্টকে সাজানো এবং আকর্ষনীয় করার জন্য এবং ডকুমেন্টের প্রয়োজনে আমাদেরকে ডকুমেন্ট -এ ছবি, যুক্ত করতে হয়।

ছবি সংযোজন

- ডুকমেন্ট এর যে স্থানে ছবিটি সংযোজন বা ইনসার্ট করবো সেখানে ক্লিক করি বা কার্সর স্থাপন করি
- ইনসার্ট মেনু এর পিকচার আইকনটিতে

ক্লিক করি
- ডেস্কটপ অথবা অন্য কোন ড্রাইভ হতে ছবি সিলেক্ট করে Insert বোতামে ক্লিক করলে ছবিটি ডকুমেন্ট -এ যুক্ত হয়ে যাবে।

শেপ (Shapes) সংযোজন

- ডকুমেন্ট এর যে স্থানে শেপ (Shapes) বা আকৃতি সংযোজন বা ইনসার্ট করবো সেখানে ক্লিক করি বা কার্সর স্থাপন করি
- ইনসার্ট মেনুতে বিদ্যমান শেপ (Shapes) আইকনটিতে

ক্লিক করি
- পাশের চিত্রের মতো একটি মেনু/শেপ (Shapes) এর তালিকা আসবে
- তালিকাটি থেকে ইচ্ছামতো যে কোন অবজেক্ট বা আকৃতিতে ক্লিক করি

- মাউস পয়েন্টারটি + চিহ্নের মতো হবে
- এবার মাউস বাটন চেপে ধরে ডানে বামে বা উপরে নিচে Drag করে বা টেনে শেপ (Shape) আঁকা যায়।

পৃষ্ঠা নাম্বার (Page Number) সংযোজন

- ইনসার্ট মেনুতে বিদ্যমান পেজ নাম্বার (Page Number) আইকনটিতে ক্লিক করি
- পাশের চিত্রের মতো একটি মেনু আসবে
- পেজের উপরের অংশে পেজ নাম্বার যুক্ত করতে চাইলে Top of Page আর নিচের অংশে পেজ নাম্বার যুক্ত করতে চাইলে Bottom of Page সিলেক্ট করতে হবে
- একটি মেনু আসবে যেখান থেকে পেজের বামে, ডানে বা মাঝে কোথায় পেজ নাম্বার সংযোজন করতে চাই সেই অনুযায়ী পেজ নাম্বার সংযোজন করা যায়।

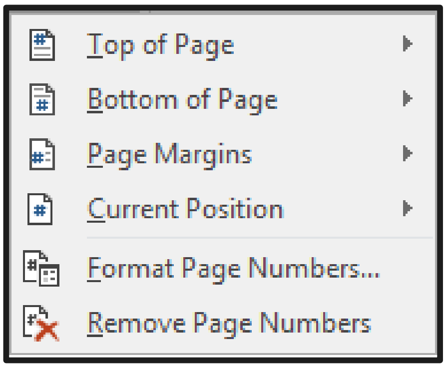

হেডার (Header) ও ফুটার (Footer) সংযোজন

বিশেষ তথ্য উল্লেখ করতে পেজের উপরের দিকেহেডার (Header) ও নিচের দিকে ফুটার (Footer) সংযোজন করতে হয়।

হেডার (Header) সংযোজন করতে-

- ইনসার্ট মেনুতে বিদ্যমান হেডার (Header) আইকনটিতে ক্লিক করি।

- পাশের চিত্রের মতো একটি মেনু আসবে।
- মেনু থেকে যে ধরনের হেডার যোগ করতে চাই তা সিলেক্ট করলেহেডার যুক্ত হবে।

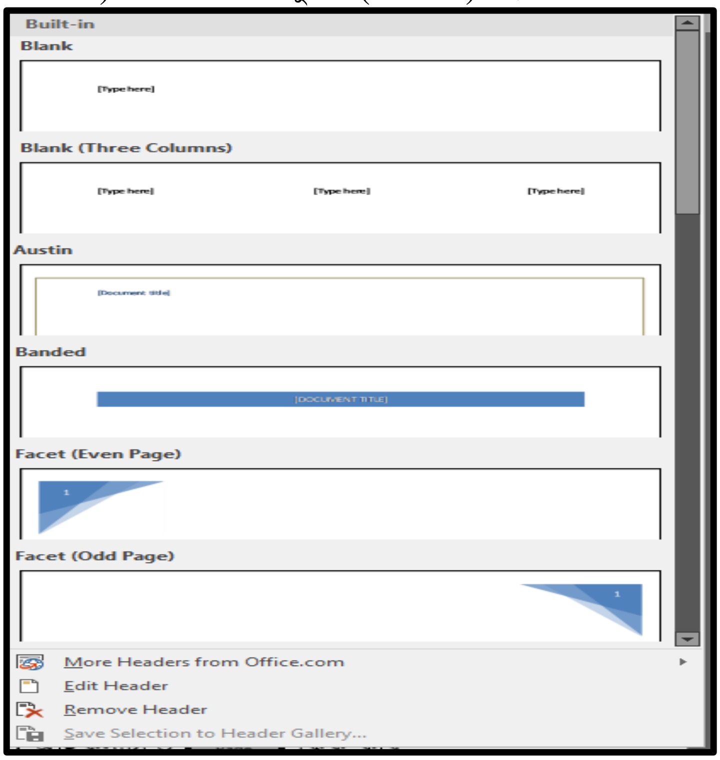

ফুটার (Footer) সংযোজন করতে-

- ইনসার্ট মেনুতে বিদ্যমান ফুটার (Footer)

আইকনটিতে ক্লিক করি।
- পাশের চিত্রের মতো একটি মেনু আসবে।
- মেনু থেকে যে ধরনের ফুটার যোগ করতে চাই তা সিলেক্ট করলে ফুটার যুক্ত হবে।

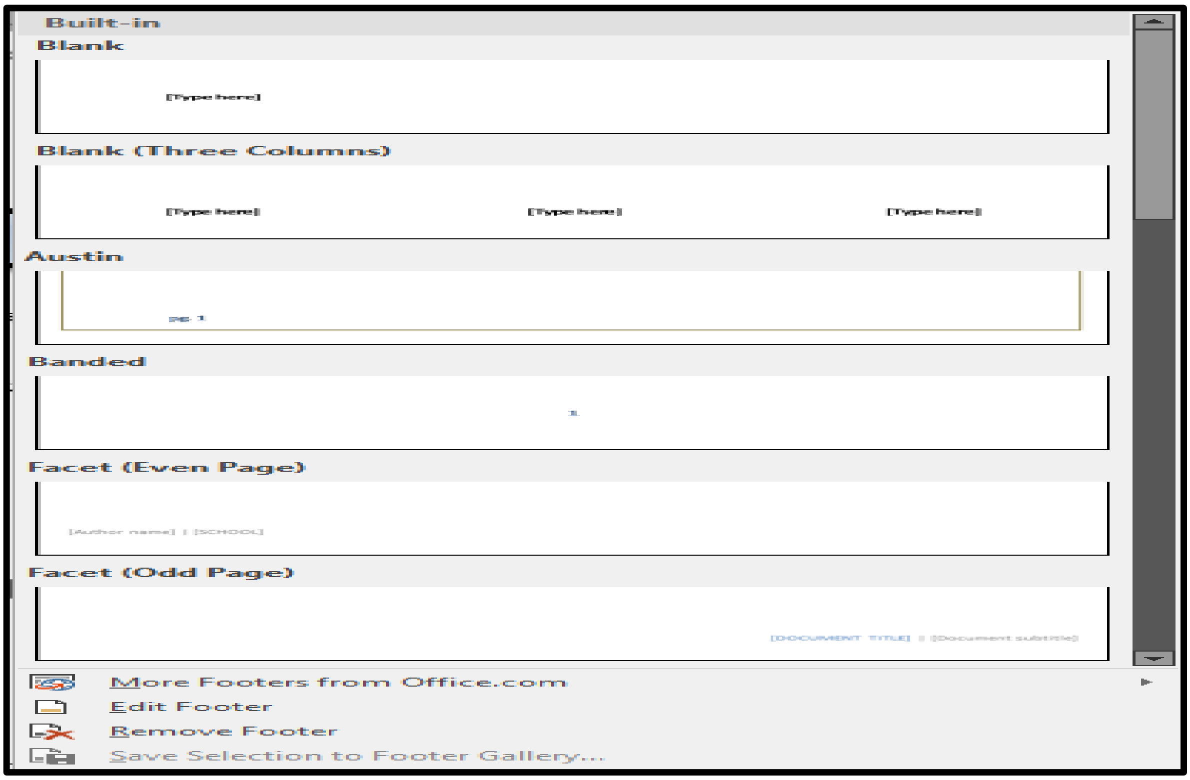

১.২.৫ পেজ সেটআপ ও প্রিন্ট করা

Page Setup (পেজ সেটআপ)

- Page Layout মেনুতে ক্লিক করি
- Margins Tool ক্লিক করি
- Margins মেনুর পুলডাউন কমান্ড লিস্ট চলে আসবে
- Custom Marginsকমান্ডে ক্লিক করি

  এই কমান্ড প্রয়োগ করলে নিচের ফিগারটি বা ডায়লগ বক্সটি প্রদর্শিত হবে।

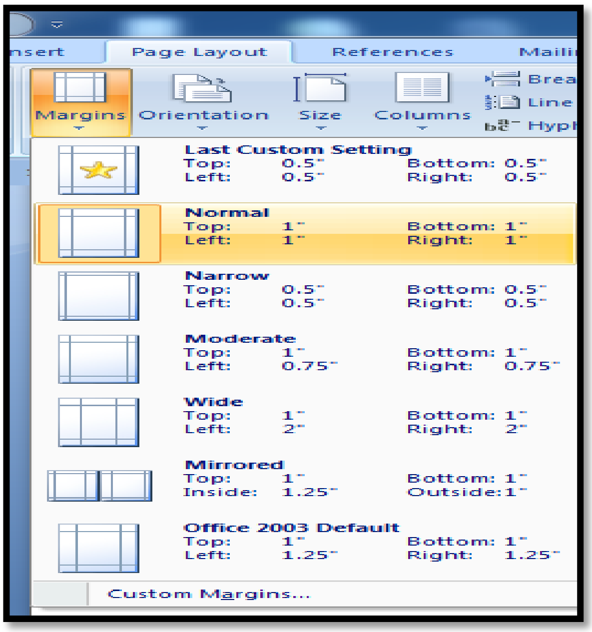

মার্জিন সেটআপ

মার্জিন অপশনে ডকুমেন্ট পেজ-এর উপর (Top margin), নিচ (Bottom margin), বাম (Left margin), ডান (Right margin) মার্জিন নির্ধারণ করি।

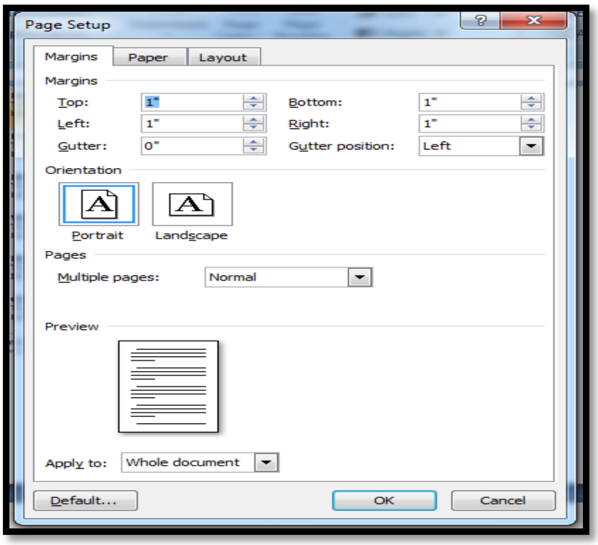

পেজ অরিয়েন্টেশন

Orientation Option-এ

- লম্বালম্বি প্রিন্ট করার জন্য Portrait/আড়াআড়ি প্রিন্ট করার জন্য Landscape ক্লিক করি
- OK ক্লিক করি।

পেপার সাইজ

Dialogue box -এর Paper Sizeট্যাবে ক্লিক করি।

পছন্দের পেপার সাইজ সিলেক্ট করি।

যেমন A4 Size/ Legal Size/Letter Size ইত্যাদি

- ডায়লগ বক্সের নিচে ডান পাশের মতো OK button ক্লিক করি।
- ডকুমেন্টের পেইজ সেটআপ সম্পন্ন হলো।

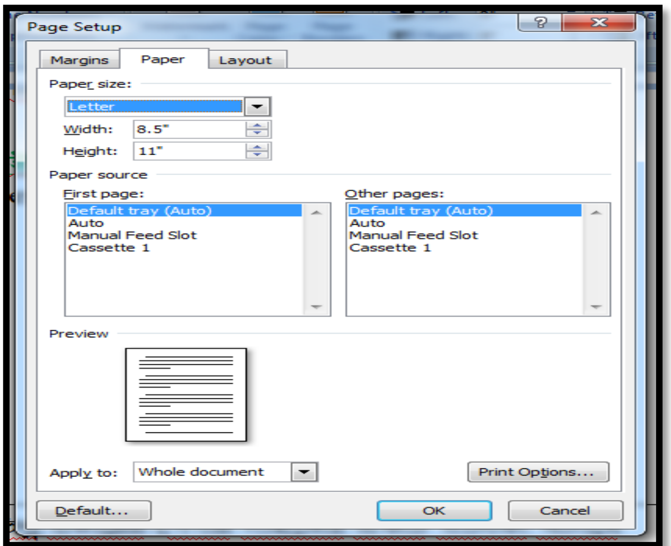

Print (প্রিন্ট)

প্রিন্ট করার কৌশলঃ

- ফাইল মেনুতে ক্লিক করে প্রিন্ট কমান্ডে ক্লিক করি
- প্রিন্ট ডায়ালগ বক্সটি আসলে যে সকল পেজ প্রিন্ট করতে চাই তার নাম্বার উল্লেখ করে OKবাটন ক্লিক করলে ডকুমেন্টটি প্রিন্ট হবে।

১.২.৬ একটি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট তৈরি ও সংরক্ষণ

উপরে উল্লেখিত টেক্সট কম্পোজ ও এডিট করার নির্দেশনা অনুসরণ করে আমরা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারি এবং তৈরিকৃত ডকুমেন্ট মেমোরি ডিভাইসে সংরক্ষণ করতে পারি। এছাড়া ইমেইল এর মাধ্যমে ডকুমেন্ট আদান প্রদান করতে পারি।

১.৩ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে মৌলিক দক্ষতা: মাইক্রোসফট এক্সেল

মাইক্রোসফট এক্সেল একটি স্প্রেডশীট এনালাইসিস সফটওয়্যার। এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ নির্ভুলভাবে করতে পারি। যেমন-

- সাধারণ হিসাব -নিকাশ: যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি
- আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ: জমা খরচ, বিল-ভাউচার, হিসাব ব্যয় বিবরণী ইত্যাদি
- স্ট্যাটিস্টিক্যাল হিসাব-নিকাশ: চার্ট বা গ্রাফ, গড়, মধ্যক, প্রচুরক ইত্যাদি
- এনালাইসিস
- বেতন বিবরণী
- ফলাফল শীট ইত্যাদি

মাইক্রোসফট এক্সেল প্রোগ্রামটির বিভিন্ন ভার্সন যেমন– মাইক্রোসফট এক্সেল 97, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 ইত্যাদি প্রচলিত রয়েছে। আমরা এ পর্যায়ে মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল (Microsoft Office Excel) 2010 ভার্সনটি নিয়ে কাজ করব।

অবস্থান: All Programs ফোল্ডারের মাইক্রোসফট অফিস প্যাকেজে বা সরাসরি প্রোগ্রাম তালিকায় মাইক্রোসফট এক্সেল প্রোগ্রামটির অবস্থান। একে সহজে ব্যবহারের জন্য শর্টকাট আইকন (Shortcut Icon) হিসেবেও কম্পিউটার ডেস্কটপে (Desktop) রাখা যায়।

১.৩.১ ওয়ার্কবুক বা ওয়ার্কশীট খোলা ও সেভ করা

নিম্নে প্রদত্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরন করে মাইক্রোসফট এক্সেল প্রোগ্রামটি চালানো যায়।

পদ্ধতি ১

- স্টার্টমেনুতে ক্লিক করি
- সেখান থেকেAll Programs মেনুতে ক্লিক করলে প্রোগ্রামসমূহের একটি তালিকা আসবে
- তালিকা থেকে প্রোগ্রামটিতে ক্লিক করে এমএস এক্সেল প্রোগ্রামটি চালু করি।
- পাশের চিত্রের মতো New বাটনটিতে ক্লিক করে Blank Work book আইকনটি সিলেক্ট কওে Create বোতামে ক্লিক করলে নতুন ওয়ার্ক বুক তৈরি হয়ে যায়।

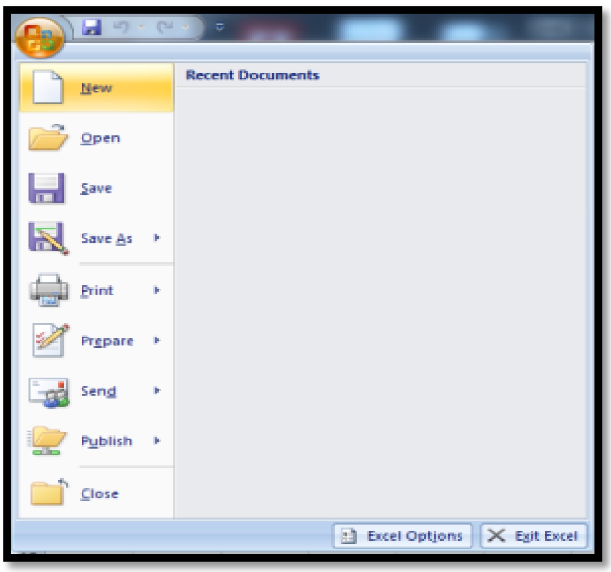

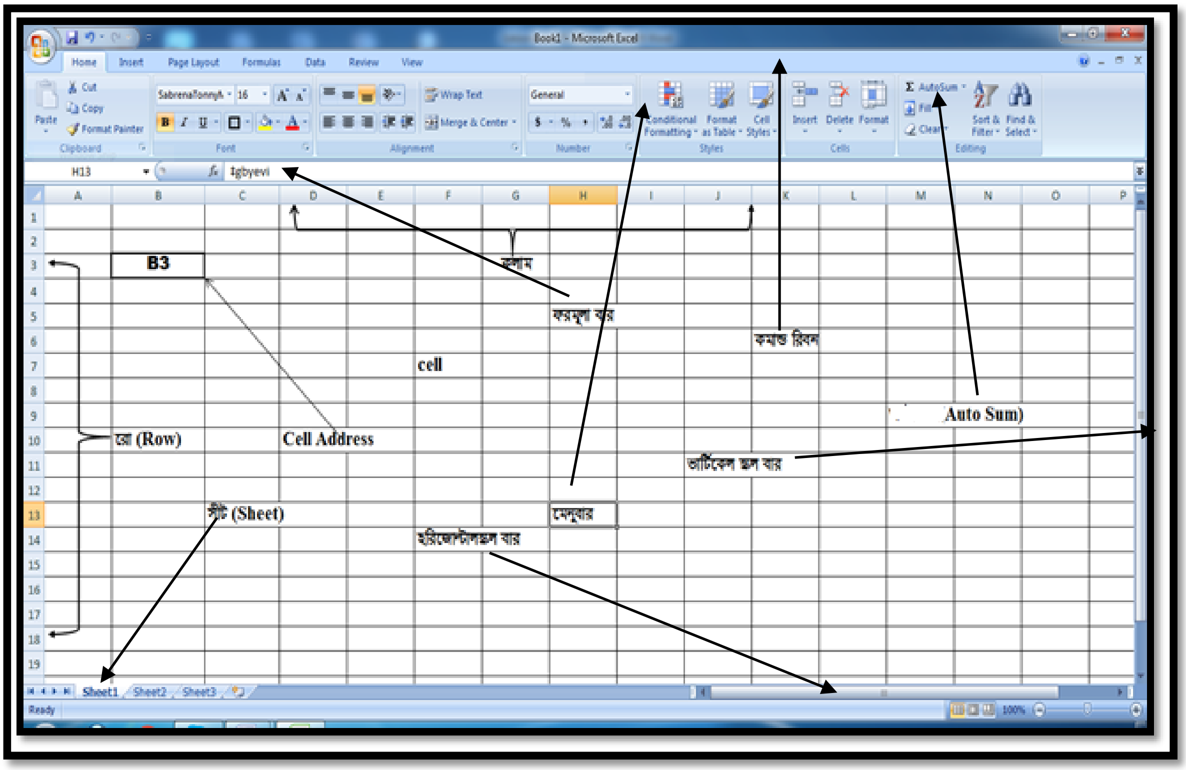

মাইক্রোসফট এক্সেল (Microsoft Excel) শীট এর বিভিন্ন অংশ

- এমএস এক্সেল এর শীট বা ডকুমেন্ট পেজের সমস্ত অংশ জুড়েই রয়েছে টেবিল অর্থাৎ সেল, রো, কলাম এর সমাবেশ।
- **কলাম**(Column): উপর থেকে নিচে লম্বালম্বিভাবে প্রদর্শিত সেলের সমাবেশ হলো কলাম। যেমন−A, B, C, D, E ইত্যাদি দিয়ে কলাম হেডিং বা কলামের শিরোনাম নির্দেশ করে।
- **রো** (Row): বাম থেকে ডানে আড়াআড়িভাবে প্রদর্শিত সেলের সমাবেশ হলো রো। যেমন−1,2,3,4,5,6 ইত্যাদি দিয়ে রো বা সারির ক্রমিক নম্বর নির্দেশ করে।
- Microsoft Excel-এর একটি শীটে16384টি কলাম(Column)এবং 1048576টি রো বা সারি (Row) রয়েছে।
- ছক বা টেবিলের ছোট ছোট ঘরগুলো হলো সেল। যেমন B3 একটি সেল। এখানে B দিয়ে কলামকে নির্দেশ করে আর 3 দিয়ে রো নম্বরকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ B3 হলো B কলামের 3 নম্বর সেল।
- সেল পয়েন্টার (Cell Pointer): শীটের মাঝে যেখানে মাউস পয়েন্টার অবস্থান করে তা হলো সেল পয়েন্টার।
- ওয়ার্কবুকে চাহিদা অনুযায়ী শীট তৈরি করা যায়।

- ভার্টিকেল বা উল্লম্ব স্ক্রল বার:এ স্ক্রলবার এ মাউস ক্লিক করে ওয়ার্কশীটকে উপরে নিচে সরানো যায়।
- অনুভূমিক বা হরাইজোন্টাল স্ক্রল বার: এর সাহায্যে ওয়ার্কশীটটিকে ডানে বা বামে সরানো যায়।

মাইক্রোসফট এক্সেলে সেভ করা

✓ এই টাইটেল বারের সর্ব বামে ফ্লপি ডিস্কের আইকনটিতে ক্লিক করি 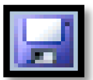 অথবা কী বোর্ডে Ctrl+S চাপি। ডায়লগ বক্স আসলে ফাইলটির একটি নাম টাইপ করি এবং Save বোতামে ক্লিক করে ফাইলটি সেভ করি।

১.৩.২ ডাটাএন্ট্রি, সংরক্ষণ ও সম্পাদনা

হিসাব-নিকাশ অতি দ্রুত এবং সহজে সম্পন্ন করার জন্য এক্সেলএকটি চমৎকার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। এক্সেলব্যবহার করে আমরা সহজেই আমাদের প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ করতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ– গাণিতিক প্রক্রিয়ার ব্যবহার:

যোগ (Sum): এক্সেল (MS Excel) উইন্ডোর রিবন বা স্টান্ডার্ড টুলস বার -এ রয়েছে সামেশন চিহ্ন। এখানে এই চিহ্নটির নাম অটোসাম (Auto Sum)। 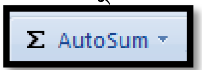

অটো সাম এ ক্লিক করে সহজেই কতগুলো সংখ্যার যোগফল বের করা যায়। নিচের উদাহরণটি লক্ষ করুন।

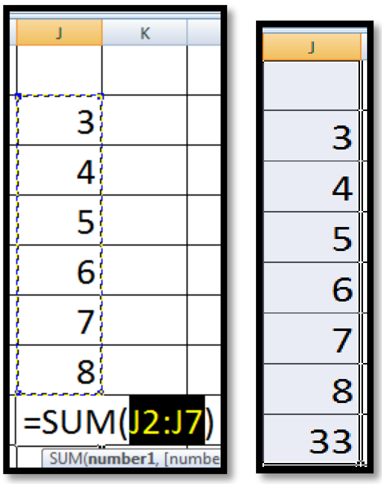

আবার সূত্র বা ফরমুলা লিখেও উপরের যোগ অংকটি করতে পারি। সে ক্ষেত্রে ফরমুলা হবে নিম্নরূপ:

✓ ধরি, সংখ্যাগুলো **J Column** এর **J2, J3, J4, J5, J6 এবং J7** সেল এ রয়েছে।

✓ যে সেলে যোগফল পেতে চাই (J8সেল) সেই সেলে ক্লিক করে J8 সেল-এ = **Sum (J2:J7)** সূত্রটি লিখি এবং এন্টার চাপ দিই। যোগফল হবে **33**

একই নিয়মে আমরা সংখ্যা পাশাপাশি লিখে যোগ করতে পারি আবার নিচে নিচে লিখেও যোগ করতে পারি।

বিয়োগ (Subtraction): একটি সংখ্যা থেকে অন্য একটি সংখ্যা বিয়োজন করা বাদ দেয়া।

- ✓ **H10** এবং **H11**সেলে দুটি সংখ্যা নিই।
- ✓ যে সেলে বিয়োগফল পেতে চাই সেই সেলে ক্লিক করে সূত্রটি লিখি ঃ =**H10-H11** এবং এন্টার চাপ দিই। এতে বিয়োগফল নির্ণয় হবে।

225
185
40

গুণণ (Multiplication): একটি সংখ্যাকে অন্য একটি সংখ্যা দ্বারা গুণ করা । গুণ এর কম্পিউটারে ব্যবহৃত চিহ্ন হলো ‘*’

- ধরি দুটি সংখ্যা ২৫ এবং ৫ রয়েছে যথাক্রমে **G4**এবং **G5**সেলে। যে সেলে গুণফল পেতে চাই (**G6**সেল) সেই সেলে ক্লিক করি। এবার সূত্রটি লিখি (=G4*G5) এবং এন্টার চাপ দিই।গুণফল ১২৫ নির্ণয় হবে।

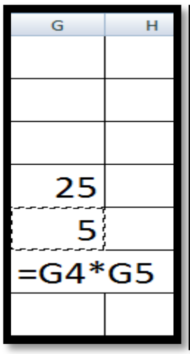

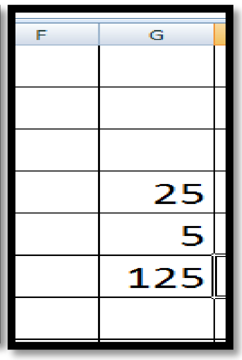

ভাগ (Division): এবার এক্সেল প্রোগ্রাম ব্যবহার করে কম্পিউটার-এ ভাগ এর ব্যবহৃত চিহ্ন হলো ‘/’।ধরি দুটি সংখ্যা ২৫ এবং ৫ রয়েছে যথাক্রমে **G4** এবং **G5** সেলে।যে সেলে **ভাগ**ফল পেতে চাই (**G6** সেল) সেই সেলে ক্লিক করে সূত্রটি লিখি (=G4/G5) এবং এন্টার চাপ দিই।ভাগফল ৫ নির্ণয় হবে।

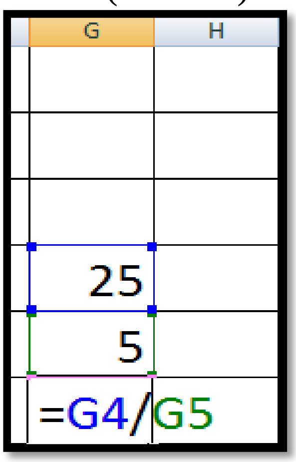

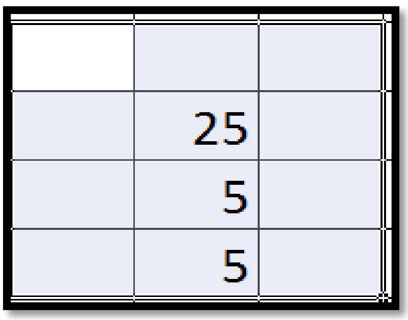

১.৩.৩ পরীক্ষার ফলাফল তৈরী

আমরা মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যবহার করে নানা ধরনের হিসাবের সীট তৈরি করতে পারি। একটি উদাহরণ হলো পরীক্ষার ফলাফল তৈরি। এজন্য আমরা একটি নমুনা ফলাফলের টেবুলেশন শীট নেব।

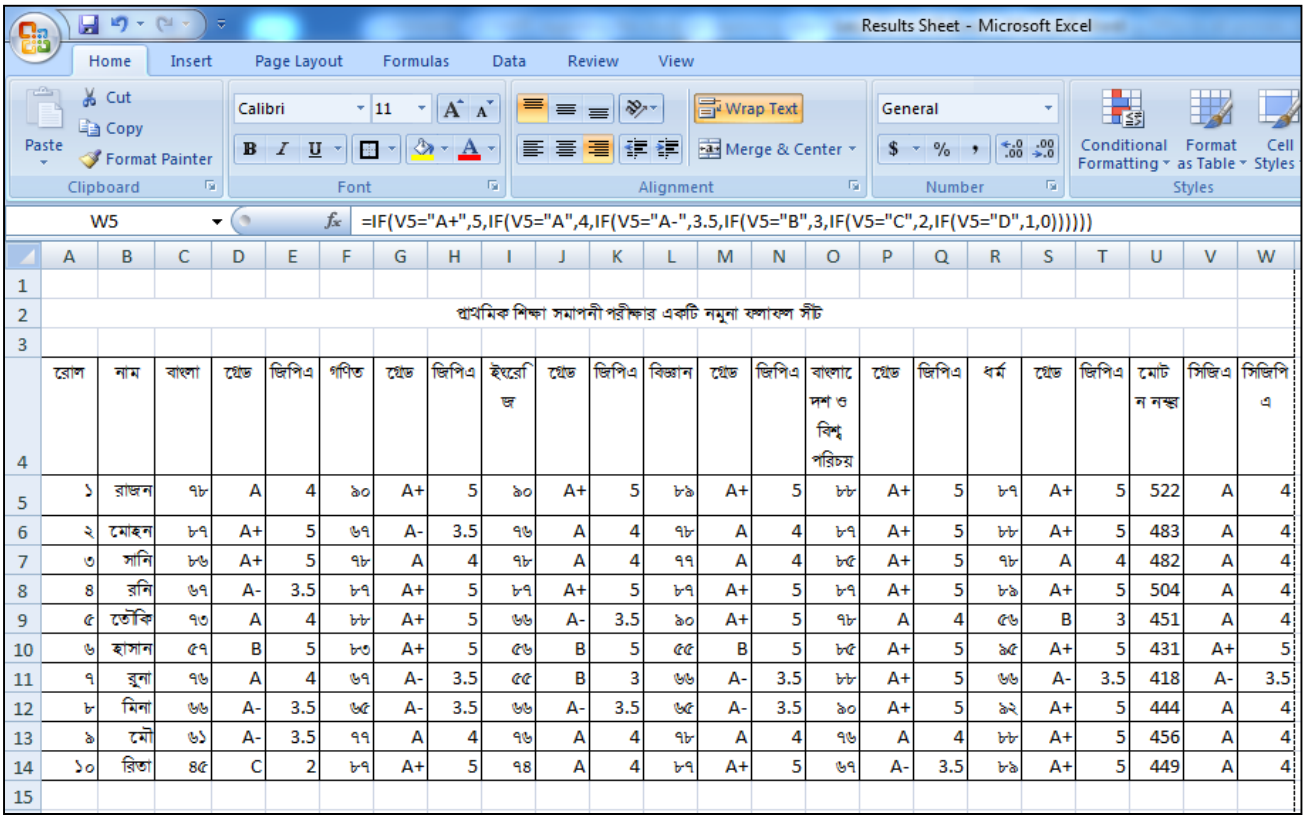

রোল	নাম	বাংলা	গ্রেড	জিপিএ	গণিত	গ্রেড	জিপিএ	ইংরেজি	গ্রেড	জিপিএ	বিজ্ঞান	গ্রেড	জিপিএ	বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়	গ্রেড	জিপিএ	ধর্ম	গ্রেড	জিপিএ	মোট নম্বর	সিজিএ	সিজিপিএ
১	রাজন	৭৮	A	4	৯০	A+	5	৯০	A+	5	৮৯	A+	5	৮৮	A+	5	৮৭	A+	5	522	A	4
২	মোহন	৮৭	A+	5	৬৭	A-	3.5	৭৬	A	4	৭৮	A	4	৮৭	A+	5	৮৮	A+	5	483	A	4
৩	সানি	৮৬	A+	5	৭৮	A	4	৭৮	A	4	৭৭	A	4	৮৫	A+	5	৭৮	A	4	482	A	4
৪	রনি	৬৭	A-	3.5	৮৭	A+	5	৮৭	A+	5	৮৭	A+	5	৮৭	A+	5	৮৯	A+	5	504	A	4
৫	তৌকি	৭৩	A	4	৮৮	A+	5	৬৬	A-	3.5	৯০	A+	5	৭৮	A	4	৫৬	B	3	451	A	4
৬	হাসান	৫৭	B	5	৮৩	A+	5	৫৬	B	5	৫৫	B	5	৮৫	A+	5	৯৫	A+	5	431	A+	5
৭	রুনা	৭৬	A	4	৬৭	A-	3.5	৫৫	B	3	৬৬	A-	3.5	৮৮	A+	5	৬৬	A-	3.5	418	A-	3.5
৮	মিনা	৬৬	A-	3.5	৬৫	A-	3.5	৬৬	A-	3.5	৬৫	A-	3.5	৯০	A+	5	৯২	A+	5	444	A	4
৯	মৌ	৬১	A-	3.5	৭৭	A	4	৭৬	A	4	৭৮	A	4	৭৬	A	4	৮৮	A+	5	456	A	4
১০	রিতা	৪৫	C	2	৮৭	A+	5	৭৪	A	4	৮৭	A+	5	৬৭	A-	3.5	৮৯	A+	5	449	A	4

চিত্র: নমুনা টেবুলেশন শীট

ফলাফল হিসাব করার প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ:

গ্রেড নির্ণয়ের সূত্র:

=IF(B17>=80,"A+",IF(B17>=70,"A",IF(B17>=60,"A-",IF(B17>=50,"B",IF(B17>=40,"C",IF(B17>=33,"D","F"))))))

জিপিএ নির্ণয়ের সূত্র:

=IF(B18>=80,5,IF(B18>=70,4,IF(B18>=60,3.5,IF(B18>=50,3,IF(B18>=40,2,IF(B18>=33,1,0))))))

মোট নম্বর নির্নয়ের সূত্রঃ
=C5+F5+I5+L5+O5+R5 সিজিপিএ নির্ণয়ের সূত্রঃ

=IF(AVERAGE(E5,H5,K5,N5,Q5,T5)>=5,"A+",IF(AVERAGE(E5,H5,K5,N5,Q5,T5)>=4,"A",IF(AVERAGE(E5,H5,K5,N5,Q5,T5)>=3.5,"A-",IF(AVERAGE(E5,H5,K5,N5,Q5,T5)>=3,"B",IF(AVERAGE(E5,H5,K5,N5,Q5,T5)>=2,"C",IF(AVERAGE(E5,H5,K5,N5,Q5,T5)>=1,"D","F"))))))

সিজিপিএ নির্ণয়ের সূত্রঃ
=IF(V5="A+",5,IF(V5="A",4,IF(V5="A-",3.5,IF(V5="B",3,IF(V5="C",2,IF(V5="D",1,0))))))

সীটের যে সেল-এ যে ফলাফল পেতে চাই সেই সেল-এ প্রথমে = চিহ্ন টাইপ করে উপরের নিয়মে সূত্র লিখি এবং এন্টার বাটন চাপ দিই। এই পদ্ধতিতে চর্চা করলে সমস্যাটি সমাধান করা যাবে।

৩.১.৪ ডাটাবেস এর প্রাথমিক ধারণা

ডাটাবেস হলো কম্পিউটার ভিত্তিক একটি পদ্ধতি, যার সাহায্যে সংগৃহীত উপাত্ত সংরক্ষণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী পুনরুদ্ধার করা যায়। অন্য কথায়, ডাটাবেস হচ্ছে সংগৃহীত উপাত্তের ভান্ডার, যা থেকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন উপায়ে এবং আকারে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। আরও সহজভাবে বলতে গেলে, ডাটাবেস হলো অসংখ্য উপাত্তের একটি সুসজ্জিত তালিকা, যেখান থেকে নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় কোনো উপাত্তকে দ্রুত এবং খুব সহজেই শনাক্ত করার উপায় বা পন্থা আছে। এ তথ্যভান্ডারে বিভিন্ন প্রকার এবং বিপুল পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা হয়। একজন ব্যবহারকারী তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো তথ্য এ তথ্যভান্ডার থেকে আহরণ বা সংগ্রহ করতে পারেন।

৩.১.৫ প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যবহৃত ডাটাবেস পরিচিতি ও ব্যবহার

বর্তমানে বাংলাদেশের সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্টানসহ সর্বক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তসমূহ সুশৃংখল, সুসন্নিবেশিত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাজানো ডাটাবেসে সংরক্ষিত আছে। তথ্যের এই ব্যবস্থাপনাকে আমরা ডাটাবেস বলে থাকি। জাতীয় পরিচয়পত্র (National ID) ডাটাবেস আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় ডাটাবেস।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার তথ্য-উপাত্ত ব্যবস্থাপনার ডাটাবেস রয়েছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার তথ্য ব্যবস্থাপনায় এসব ডাটাবেসের গুরুত্ব অপরিসীম। www.mopme.gov.bd ও www.dpe.gov.bd সাইট/ পোর্টালসমূহে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বশেষ হালফিল তথ্যভিত্তিক ই-প্রাইমারী স্কুল, ই-স্কুল মনিটরিং, ই-একাউন্টিং, ই-বুক ডিস্ট্রিভিউশন, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ডাটবেস রয়েছে।

এসব ডাটাবেস থেকে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিদ্যালয়, বিদ্যালয়সমূহের সম্পদ, উপস্থিতির হার, সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি পাওয়া যায়।

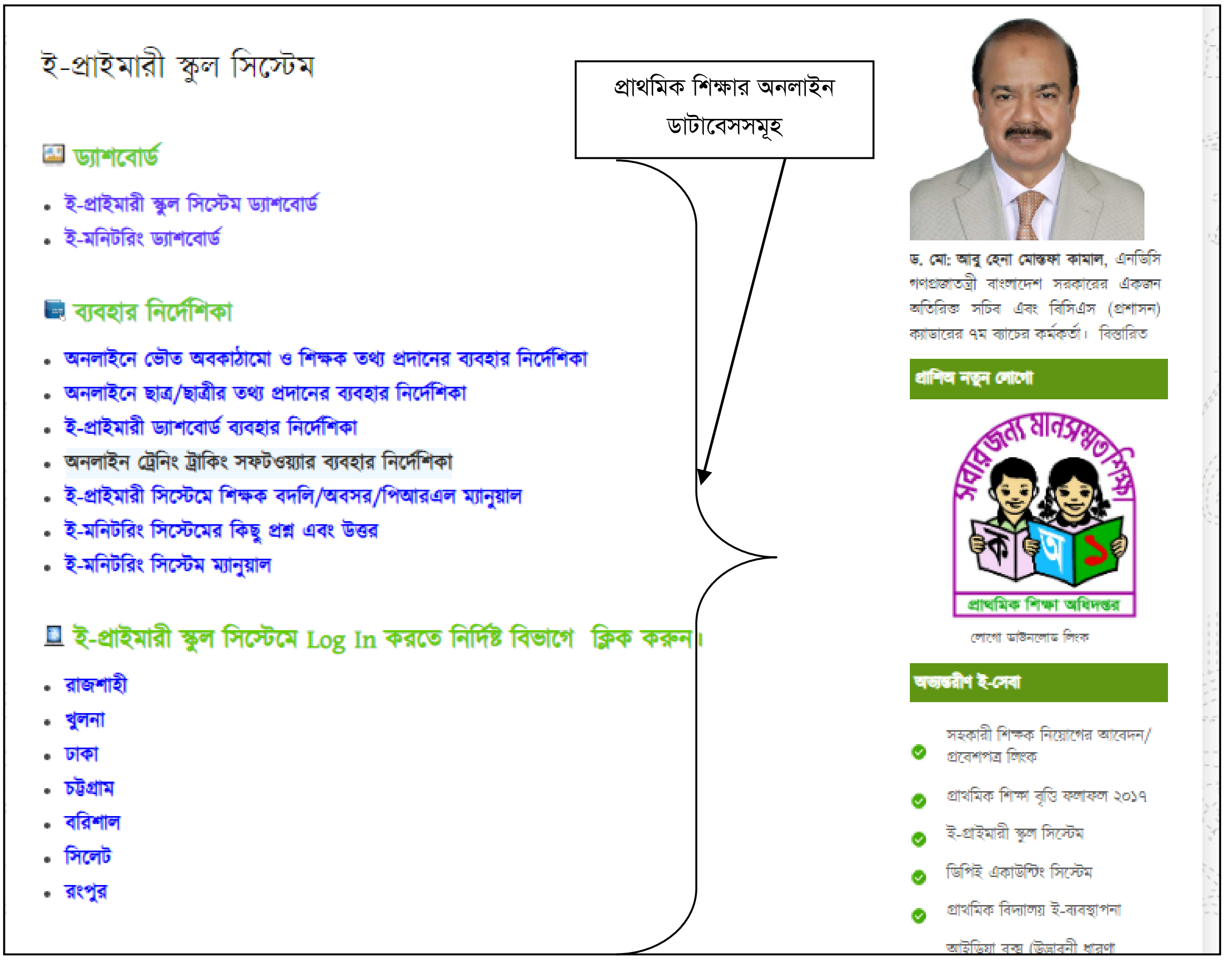

১.৩.৬ ই-মনিটরিং

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো, নিবন্ধিত সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের তথ্য একটি একক ডাটাবেজে সংগ্রহ করার বিশাল কাজ শুরু করেছে। এই ওয়েব-বেজড সিস্টেম শুধুমাত্র একটি ডাটাবেজ তৈরি করার জন্য নয় বরং শিক্ষক ও শিক্ষা অফিসারদের কাজের চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অতীতে তারা কাগজ-কলমের সাহায্যে পুরো প্রাথমিক বিদ্যালয় মেয়াদে শিক্ষার্থীদের তথ্য এবং তাদের পারফর্মেন্স লিপিবদ্ধ করার কাজটি করতেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সেভ দ্যা চিলড্রেন এর সহায়তায় এই সিস্টেম তৈরির কাজটি করছে। বর্তমানে এই সিস্টেমের অধীনে তিনটি মডিউলের উপর কাজ হচ্ছে- ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। ভবিষ্যতে আরো মডিউলের উপর কাজ হবে। তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য www.dpe.gov.bd ওয়ের পোর্টাল ব্যবহার করতে হবে।

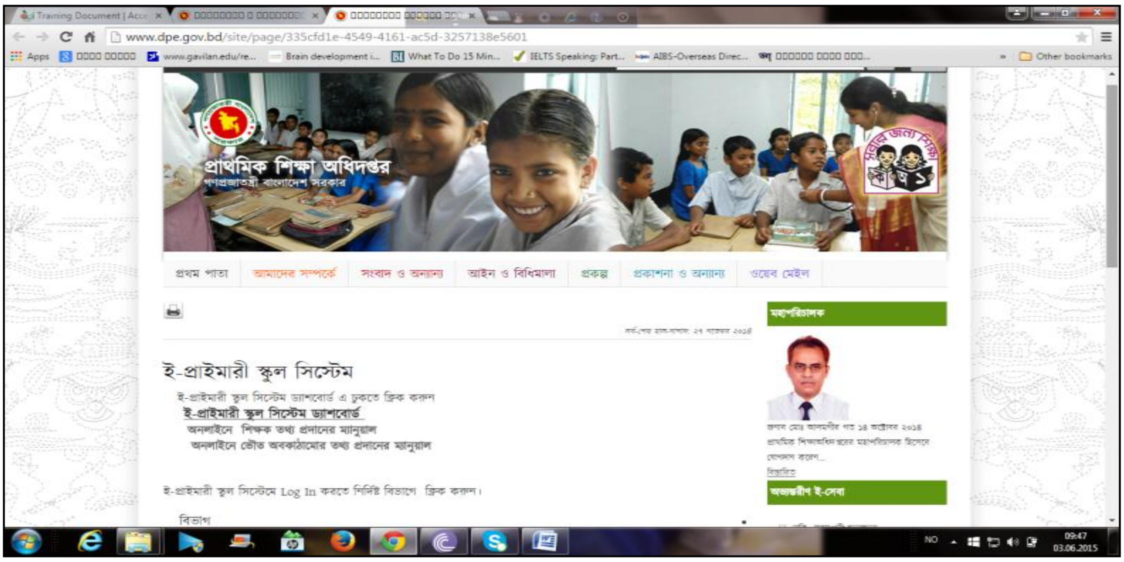

১.৪ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে মৌলিক দক্ষতা: ইন্টারনেট ও শিক্ষায় ও ব্যবহার

১.৪.১ ইন্টারনেট

ইন্টারনেট হল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কম্পিউটার নেটওয়ার্কসমূহের একটি গ্লোবাল সিস্টেম যা ইন্টারনেট প্রোটোকল স্যুইট ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী কয়েক বিলিয়ন ডিভাইসকে সংযুক্ত করে। এটি হল স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে লাখ লাখ প্রাইভেট, পাবলিক, এ্যাকাডেমিক, বিজনেস, সরকারী ইত্যাদি নেটওয়ার্কের দ্বারা গঠিত নেটওয়ার্কসমূহের নেটওয়ার্ক। সহজ কথায়, ইন্টারনেট হল দেশ-বিদেশের বিভিন্ন তথ্য প্রাপ্তি ও যোগাযোগের এক বিস্ময়কর মাধ্যম।

১.৪.২ ইন্টারনেট সংযোগ

বর্তমানে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহারের জন্য মডেম (Modem) ও ব্রডব্যান্ড (Broadband) এই দুই উপায় অনুসরণ করা হয়। এই দুই পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য হলো মডেম তারবিহীন ওয়াইফাই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপরদিকে ব্রডব্যান্ড তারের সাহায্যে ইন্টারনেট সেবা দিয়ে থাকে।

মডেমের সাহায্যে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার পদ্ধতি:

মডেম ব্যবহার করে ইন্টারনেট সংযোগ দেবার জন্য প্রথমেই আমাদেরকে মডেমটি ইন্সটল করতে হবে। এ জন্য মডেমটিকে কম্পিউটারের ইউএসবি (USB) পোর্টে ঢুকাতে হবে। ইউএসবি পোর্টে মডেমটি ঢুকালে একটু পরে নিজে থেকেই একটি ডায়লগ বক্স আসবে এবং ডায়লগ বক্সটিতে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে মডেমটি ইন্সটল করে নিতে হবে। যদি অটোরান (Autorun) অপশন বন্ধ থাকার কারনে কোন ডায়লগ বক্স নিজে থেকে না

আসে তবে Computer Folder এ ঢুকলে Devices with Removeable Storage এর নিচে মডেমের আইকনটি দেখা যাবে।

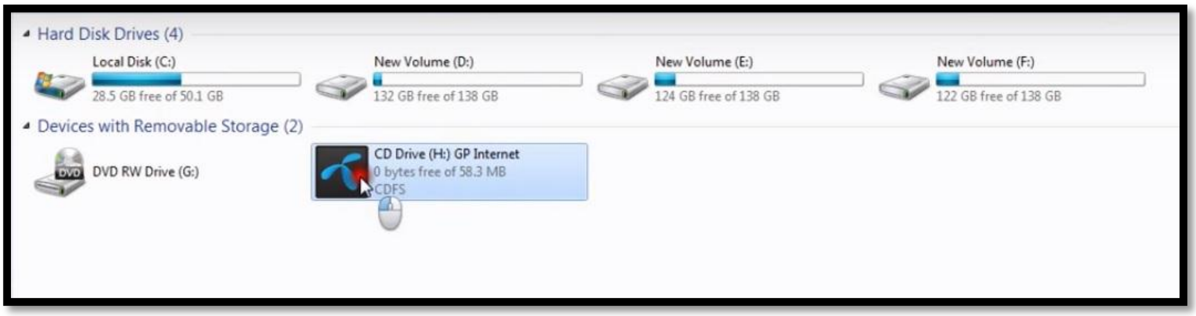

আইকনটিতে ডবল ক্লিক করে বা এন্টার বোতাম চাপলে ইন্সটলেশনের জন্য ডায়লগ বক্সটি চলে আসবে। ইন্সটলেশন শেষে Application রান (Run) করলে উইন্ডোতে ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড প্রদান করে কানেক্ট এ ক্লিক করলে ইন্টারনেট সংযোগ চালু হয়ে যাবে।

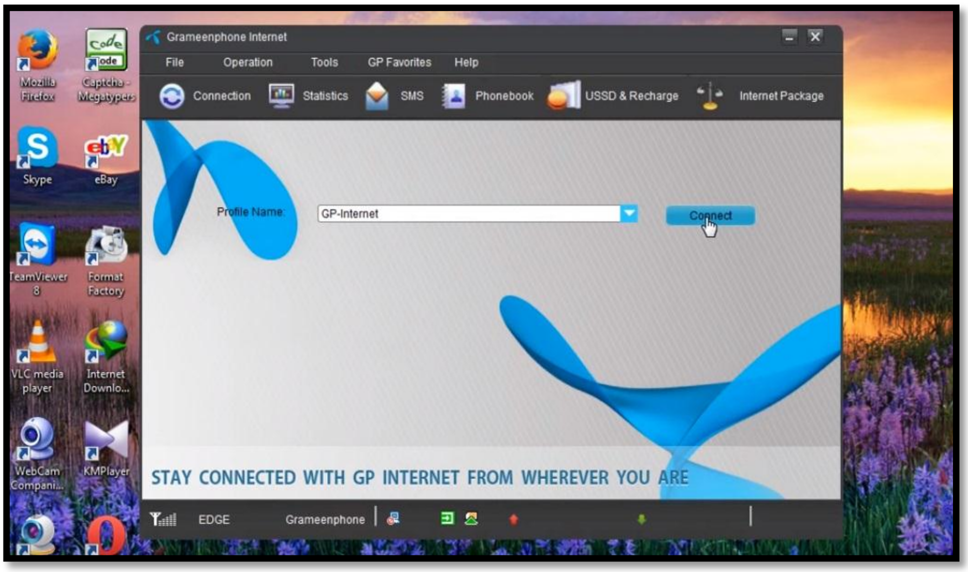

ব্রড ব্যান্ডের সাহায্যে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার পদ্ধতি:

১। Start বাটন থেকে Control Panel এ ক্লিক করি। এবার সেখান থেকে Network and Internet এর অন্তর্ভুক্ত View network status and tasks pageএ ক্লিক করি।

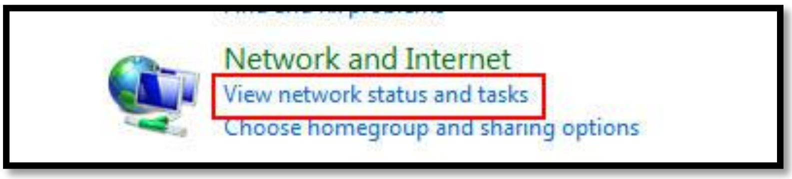

২। Set up a new connection or networkএ ক্লিক করি।

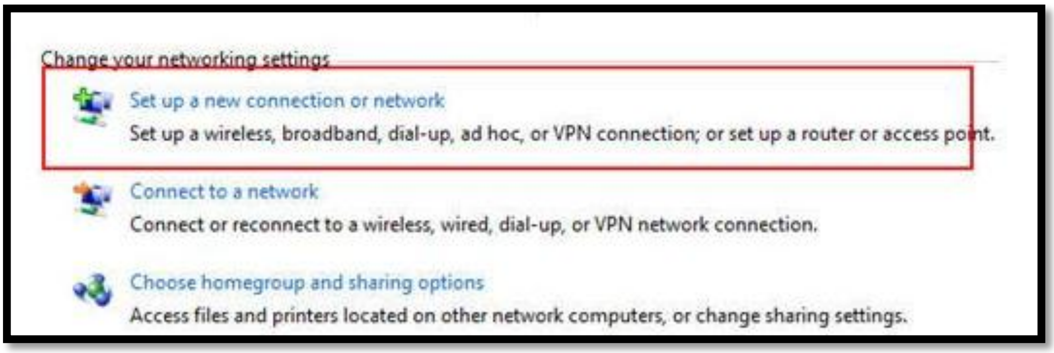

৩। Connect to the Internet সিলেক্ট করি এবং Next বোতামে ক্লিক করি।

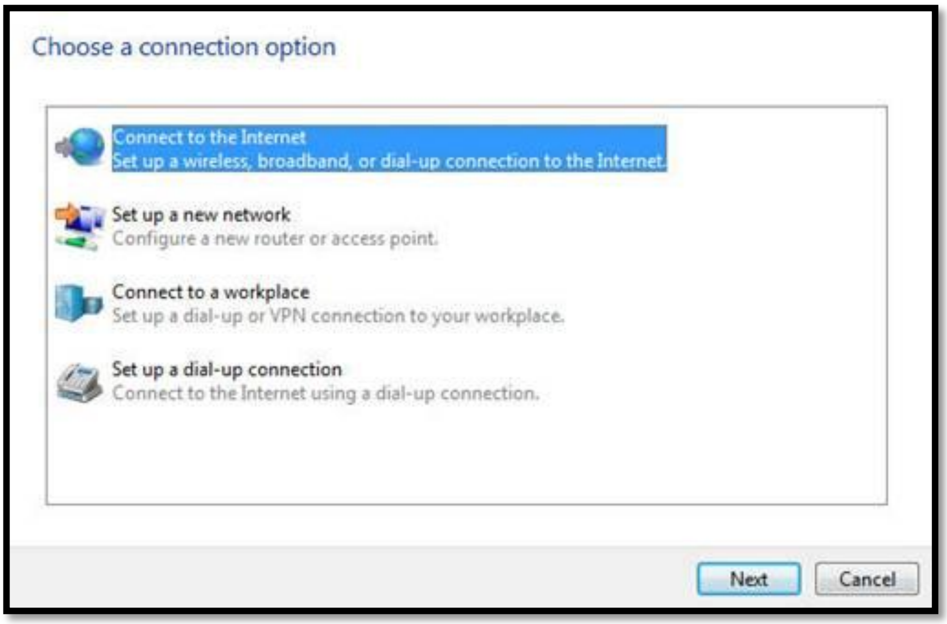

৪ ।Broadband (PPPoE) এ ক্লিক করি।

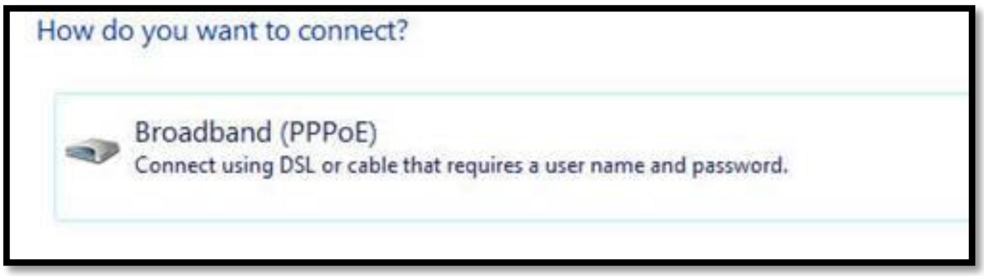

৫। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ISP) অর্থাৎ ইন্টারনেট সংযোগদাতা প্রতিষ্ঠানের থেকে দেওয়া ইউজার নেম (User Name) ও পাসওয়ার্ড (Password) যথাস্থানে প্রদান করে কানেক্ট বোতামে ক্লিক করি। প্রদত্ত তথ্য সঠিক থাকলে নিচের উইন্ডোটি আসবে এবং ইন্টারনেট সংযোগ চালু হয়ে যাবে।

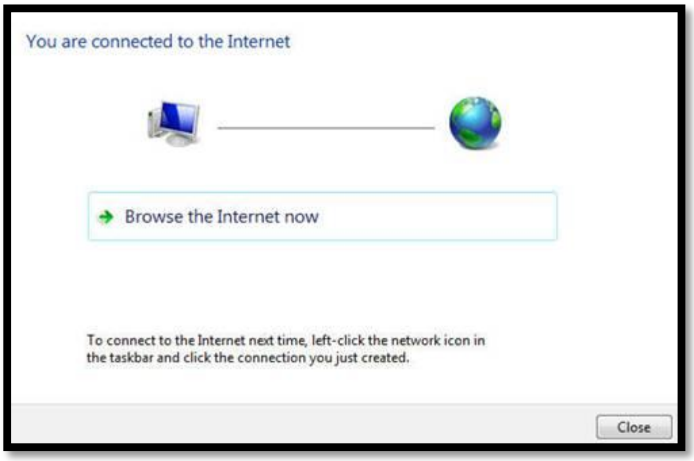

১২.৬.৩ সার্চ ইঞ্জিন যেমন- গুগল (Google)

ইন্টারনেটে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য মজিলা ফায়ারফক্স, গুগল ক্রোম, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ইত্যাদির যেকোন একটি ওয়েব ব্রাউজার নির্বাচন করুন। এই ওয়েব ব্রাউজারের এড্রেস বারে কাঙ্খিত ওয়েবসাইটের এড্রেস লিখে কীবোর্ডে Enter কী প্রেস করে ঐ ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা যায়।

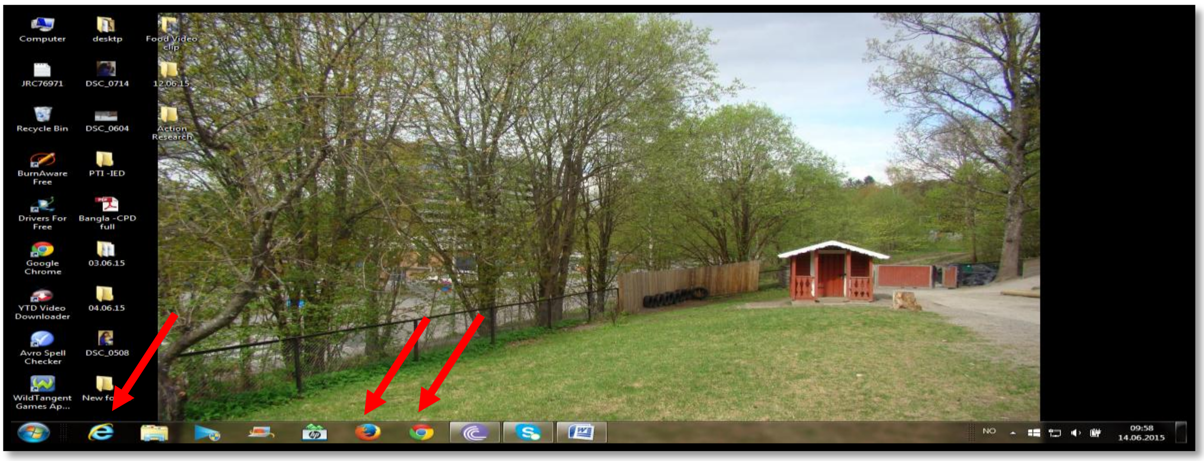

উপরের চিত্রে তীর চিহ্ন দিয়ে তিনটি ওয়েব ব্রাউজার দেখানো হয়েছে।

- এখন মজিলা ফায়ার ফক্সে ক্লিক করুন। এরপর এড্রেস বারে www.google.com টাইপ করে Enter Key প্রেস করুন।
- কয়েক সেকেন্ডের ভিতর গুগলের ওয়েবপেজটি কম্পিউটারের স্ক্রীনে আসবে। গুগল হল একটি সার্চ ইঞ্জিন, এর সাহায্যে যেকোন তথ্য সহজে খুঁজে বের করা যায়। কী তথ্য জানতে চান ঠিক করে Search Box এ সে বিষয়টি লিখুন।

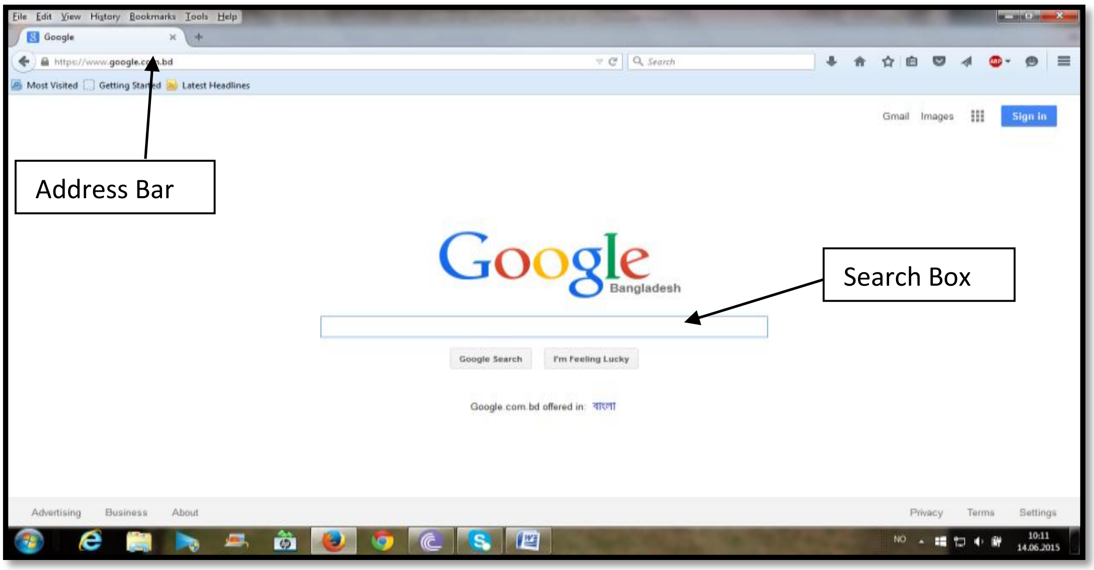

- যেমন- সার্চ বক্সে National Flag of Bangladesh টাইপ করে Enter Key প্রেস করুন। দেখবেন, অনেকগুলো ওয়েবসাইটের লিংক চলে এসেছে। যেকোন একটি ওয়েবসাইটে ক্লিক করে ঐ ওয়েবসাইটের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন এবং সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য দেখতে পারবেন।

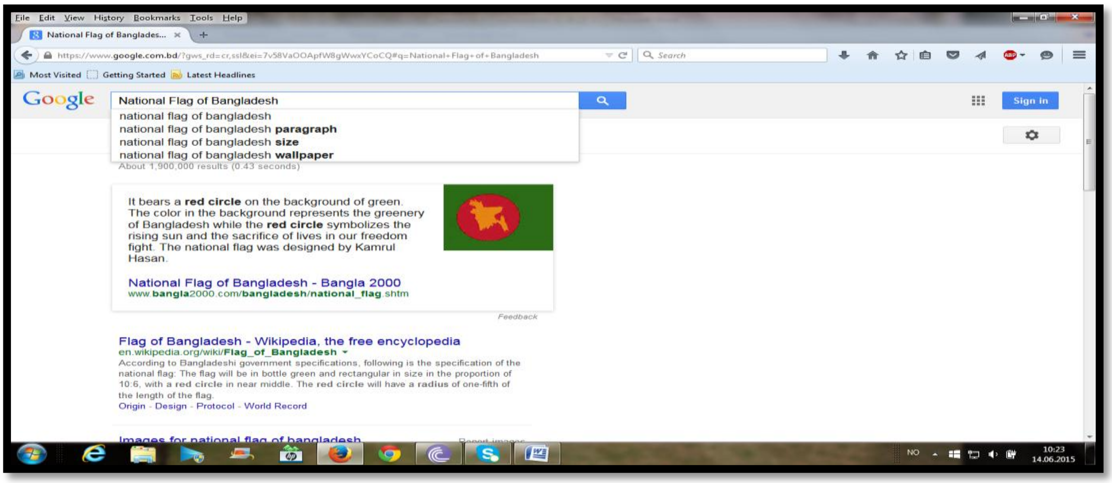

১২.৬.৪ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (যেমন- ফেসবুক ও টুইটার)

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হলো কমিউনিটি ভিত্তিক মিথস্ক্রিয়া (Interaction), তথ্যের আদান প্রদান (Data and Content Sharing) ও সহযোগিতার (Collaboration) জন্য নিবেদিত অনলাইন যোগাযোগ চ্যানেলগুলোর সমষ্টি। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে ফোরাম, মাইক্রোব্লগিং, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, সামাজিক বুকমার্কিং, সোশ্যাল কিউরেশন এবং উইকি।

বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে ফেসবুক, টুইটার, লিঙ্কডইন প্রভৃতি। ফেসবুক হলো একটি জনপ্রিয় বিনামূল্যে ব্যবহারযোগ্য সামাজিক নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইট যেখানে ব্যবহারকারীরা

একটি প্রোফাইল নিবন্ধন করে সেই প্রোফাইল থেকে বার্তা/ছবি/ভিডিও আপলোড করতে পারে এবং পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে। টুইটার হচ্ছে একটি মাইক্রোব্লগিংসেবা যেখানে নিবন্ধিত ব্যবহারকারীরা টুইট বা ছোট ছোট পোস্ট আপলোড করে থাকে এবং একজন ব্যবহারকারী আরেকজন ব্যবহারকারীকে ফলো করতে পারে।

১.৪.৫ ওয়েবপেজ ও তথ্য খুঁজে বের করা, নির্ভরযোগ্য তথ্য উৎস

ইন্টারনেটে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য মজিলা ফায়ারফক্স, গুগল ক্রোম, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ইত্যাদি যেকোন একটি ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করা যেতে পারে। ইন্টারনেটে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য জনপ্রিয় একটি সাইট হচ্ছে www.google.com। নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে তথ্যের উৎসের একটি ক্রম নিচে দেওয়া হলো-

১। অনলাইন peer-reviewed গবেষণা প্রবন্ধ
(যেমন:*http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp*)

২। .edu/.ac

৩। প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট যেমন UNESCO, UNDP, UNFPA,WHO

৪। সরকারি ওয়েবসাইট .gov

৫। .org যেমন wikipedia অর্গানাইজেশন বা সংস্থা সেবাভিত্তিক সাইট এর ডোমেইন ক্যাটাগরি

৬। .com কমার্শিয়াল সেবাভিত্তিক সাইট এর ডোমেইন ক্যাটাগরি

৭। .net নেটওয়ার্কিং বা ইন্টারনেট সেবাভিত্তিক সাইট এর ডোমেইন ক্যাটাগরি

১. ৪.৬ ফাইল ও ইমেজ ডাউনলোড করা

ইমেজ ডাউনলোড

প্রথমে ওয়েব ব্রাউজার খুলে কাঙ্ক্ষিত ইমেজের নাম ব্রাউজারের সার্চবারে লিখে এন্টার বোতামে ক্লিক করতে হবে। ব্রাউজারে (উদাহরণস্বরূপ Google Chrome) সার্চবারের নিচে থেকে ইমেজ (Image) এ ক্লিক করলে শুধু ছবিগুলো আলাদা ভাবে দেখা যাবে। এখান থেকে পছন্দমত ছবিটিতে ক্লিক করে View Image এ ক্লিক করতে হবে।

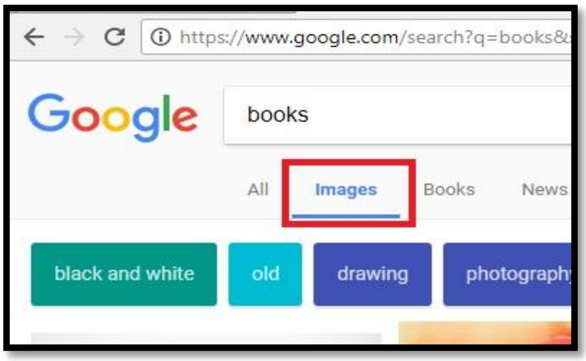

এবার ছবিটি লোড হলে ছবিটির উপর মাউসের ডান বাটন ক্লিক করি এবং মেনু থেকে এ Save Image As এ ক্লিক করতে হবে ও কাঙ্ক্ষিত স্থানে সেভ (Save) করতে হবে।

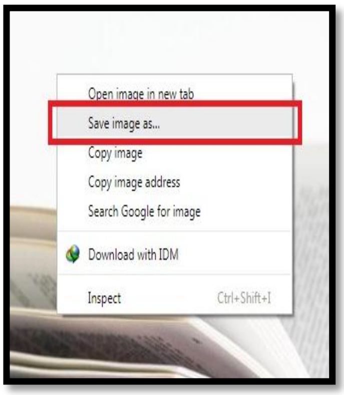

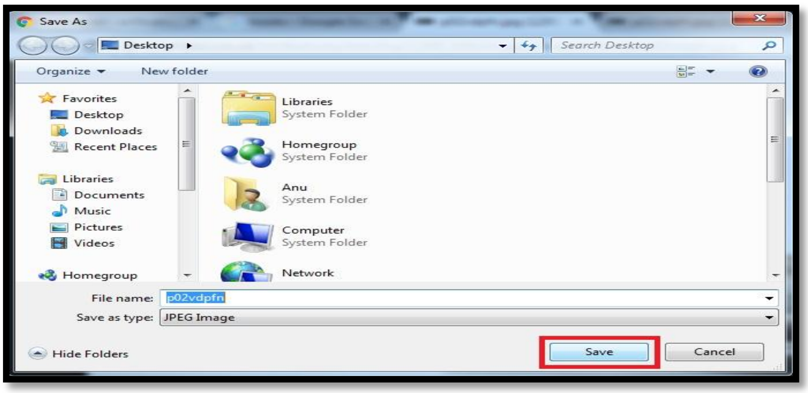

এছাড়া যেকোন ওয়েবসাইটে ঢুকে পছন্দমত ছবিতে ডান মাউস বাটন ক্লিক করে একই পদ্ধতিতে ছবি সেভ (Save) করা যাবে।

ফাইল ডাউনলোড

ওয়েব ব্রাউজারে কাঙ্ক্ষিত ফাইলের নাম সার্চবারে লিখে এন্টার বোতামে ক্লিক করতে হবে। এবার সার্চ রেজাল্ট থেকে কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটে ঢুকে ফাইলটির ডাউনলোড লোগোতে ক্লিক করলে ফাইল ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে। ডাউনলোড লোগো সাইট বা ফাইলভেদে বিভিন স্থানে থাকতে পারে। সাধারণত ব্রাউজারের একদম নিচে ডাউনলোড এর অবস্থা বা ডাউনলোডকৃত ফাইলটি দেখান হয়।

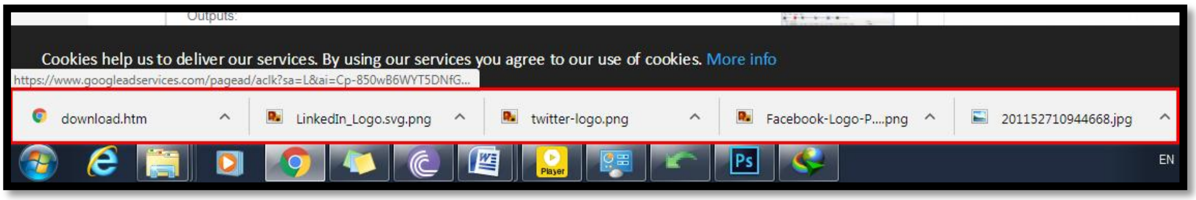

১. ৪.৭ ই-মেইল আদান-প্রদান

ইমেইল আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন ইমেইল সেবাদানকারী ওয়েবসাইট রয়েছে। এর মধ্যে জিমেইল(Gmail), ইয়াহু (Yahoo), আউটলুক(out look) ইত্যাদি অন্যতম। ইমেইল আদান প্রদানের জন্য প্রথমে যেকোন একটি ইমেইল সেবাদানকারী ওয়েবসাইটে (উদাহরণস্বরূপ Gmail) ঢুকে একটি মেইল অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে (যদি অ্যাকাউন্ট না থাকে)। এরপর আকাউন্টটিতে মেইল অ্যাড্রেস ও পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রবেশ করতে হবে।

মেইল পাঠাতে চাইলে কম্পোজ (Compose) এ ক্লিক করলে একটি ডায়লগ বক্স আসবে। এখানে এ প্রাপকের মেইল আইডি (To), ইমেইলের বিষয়বস্তু (Subject), বডিতে (Body) ইমেইলের টেক্সট অংশ লিখতে হবে। ইমেইলে কোন ফাইল অ্যাটাচ করতে চাইলে Attach Files আইকনে ক্লিক করে কাঙ্ক্ষিত ফাইলটি সিলেক্ট করতে হবে। এবার Send এ ক্লিক করলে ইমেইলটি প্রাপকের কাছে চলে যাবে।

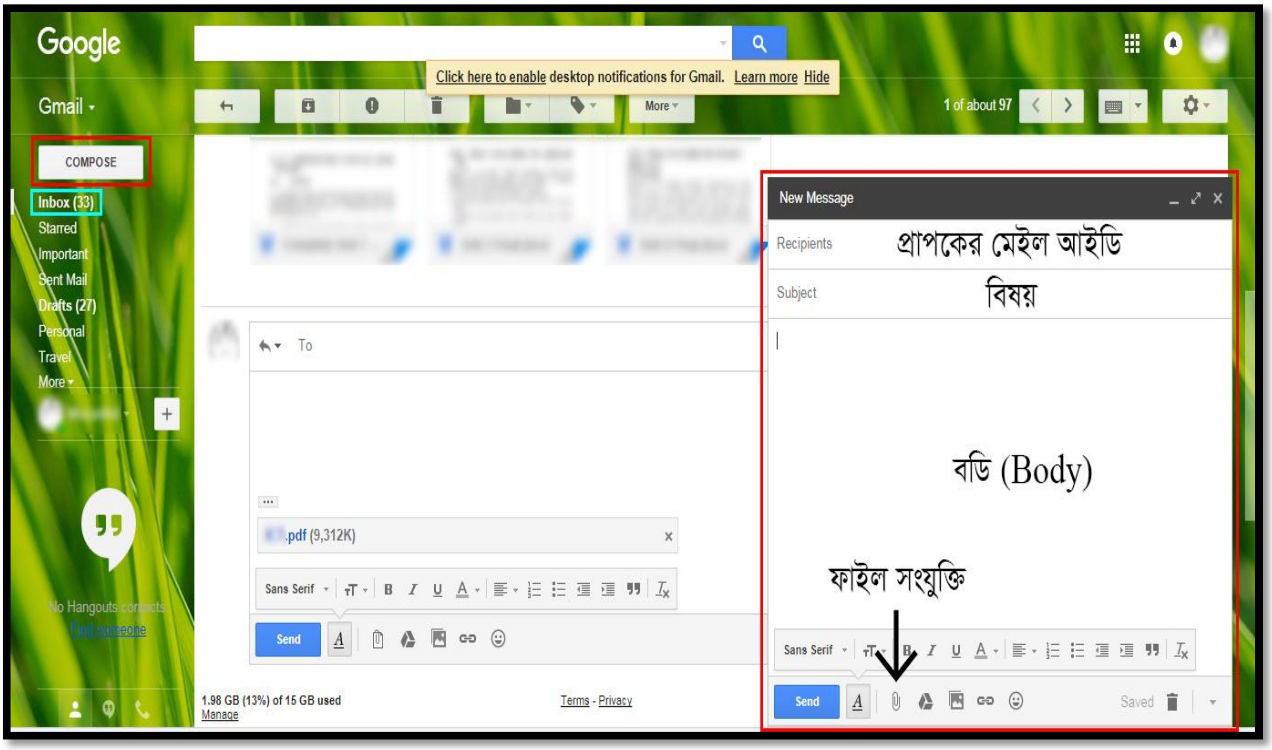

আর অন্য কেউ যদি ইমেইল পাঠায় তবে সেটা দেখার জন্য Inbox এ ক্লিক করলেই জমা হওয়া সব ইমেইলের তালিকা দেখা যাবে।

১.৫ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে মৌলিক দক্ষতা: পাওয়ার পয়েন্ট

১.৫.১ মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট ফাইল খোলা ও সেভ

মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট হল স্লাইড শো প্রেজেন্টেশনের একটি প্রোগ্রাম, যা মাইক্রোসফট অফিসের একটি অংশ ।কম্পিউটার অন করে ডেস্কটপের Start বাটনে ক্লিক করে All Programs এ ক্লিক করলে Microsoft Office দেখতে পাবেন। Microsoft Office এ ক্লিক করে সেখান থেকে Microsoft Office Powerpoint এ ক্লিক করে প্রোগ্রামটি ওপেন করুন।

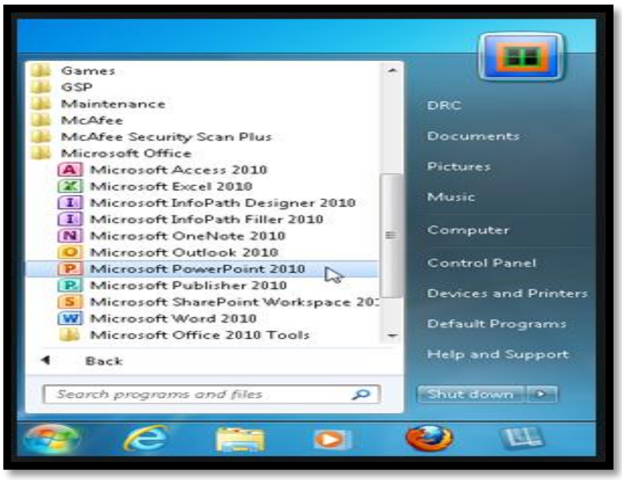

মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট এর উইন্ডোটি নিচের চিত্রের ন্যায়। চিত্রে এর বিভিন্ন অংশের নাম তীর চিহ্নের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

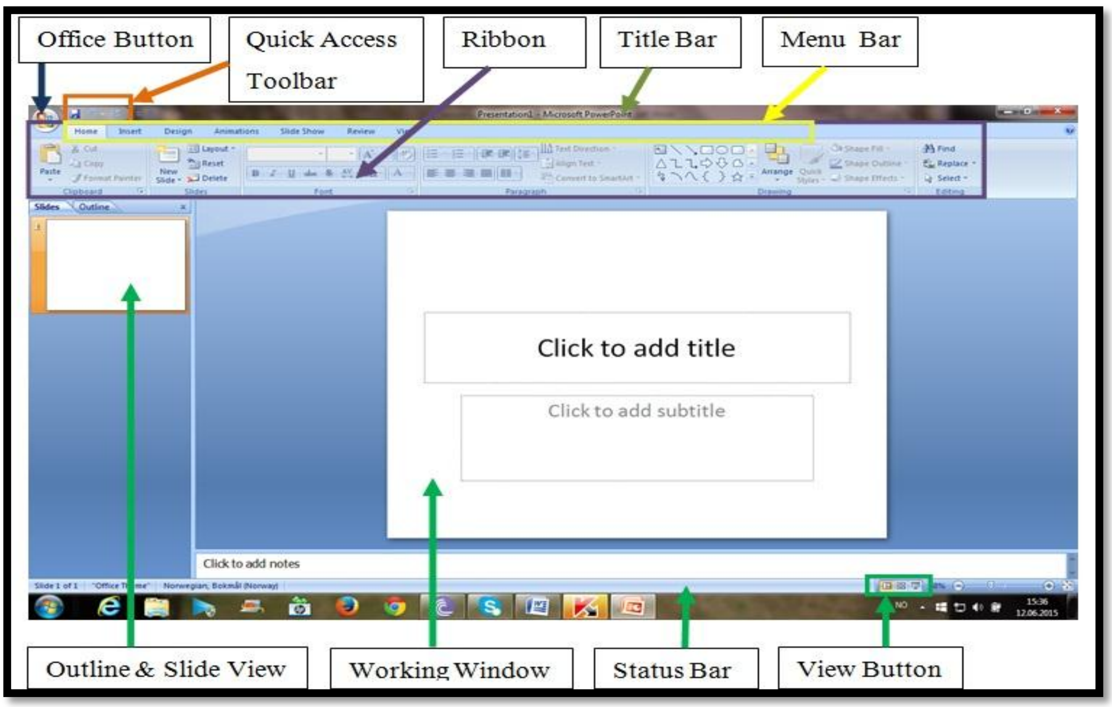

- Office Button: পাওয়ারপয়েন্ট উইন্ডোটির একদম বামে সবার প্রথম যে বাটনটি থাকে সেটি হল Office Button। এর সাহায্যে প্রেজেন্টেশন ফাইল খোলা, বন্ধ করা, সেভ করা, প্রিন্ট করা, পাবলিশ করা, প্রোগামটি বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি কাজ করা হয়।
- Quick Access Toolbar: Office Button এর ডান পাশে এই Buttonটি অবস্থিত। পাওয়ারপয়েন্টের যেকোন view থেকে এটি ব্যবহার করা যায়। প্রোগামটি খোলার পর প্রথমে এই টুলবারে শুধু Save, Undo, Redo বাটনগুলো থাকে। তবে কেউ চাইলে তার পছন্দমত কমান্ড এখানে Customize করে নিতে পারে।
- Ribbon: এতে সুনির্দিষ্ট কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত কতগুলো ট্যাব থাকে। প্রত্যেকটি ট্যাবে আবার কিছু কমান্ড গ্রুপের অধীনে কয়েক ধরনের টুল আছে। যেমন- Home ট্যাবের অন্তর্ভূক্ত টুলগুলো হল- Clipboard, Font, Paragraph, Styles ও Editing। প্রত্যেকটি গ্রুপের বিভিন্ন কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত বাটন, মেনু, লিস্ট আছে।এগুলো ব্যবহার করে বিভিন্ন স্লাইডে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সুবিন্যস্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়।
- View Button: পাওয়ারপয়েন্ট এর বিভিন্ন স্লাইডের কাজগুলো Slide showএ দেখতে এই বাটন ব্যবহার করা হয়।

১. ৫.২ স্লাইড তৈরি, সম্পাদনা ও ফরম্যাটিং

- পাওয়ারপয়েন্ট উইন্ডোর স্লাইডটিতে দুইটি টেক্সট বক্স দেখতে পাবেন। বাংলায় লিখতে চাইলে অভ্র বা বিজয় কীবোর্ড ব্যবহার করতে হবে। বিজয় কীবোর্ড ব্যবহার করে বাংলা লিখতে হলে আগে Alt+Ctrl+B একসাথে প্রেস করতে হবে। এরপর বাংলা ফন্ট (উদাহরণস্বরূপ SutonnyMJ) সিলেক্ট করুন। এখন স্লাইডের উপরে টেক্সট বক্সে মাউস দিয়ে ক্লিক করে লেখা শুরু করুন। নিজের নাম লিখুন। যেমন- আসমা আক্তার। নিচের অফিস টেক্সট বক্সে নিজ নিজ পদবি লিখুন এবং প্রতিষ্ঠানের নাম লিখুন। যেমন- পি.টি.আই. ইন্সট্রাক্টর, সিলেট পি.টি.আই.।
- এখন অফিস বাটনে ক্লিক করে Save চেপে ফাইলটি সেভ করুন। এছাড়াও কীবোর্ডে Ctrl+S চেপে বা Quick Access Toolbar এ Save বাটনে ক্লিক করে ফাইলটি সেভ করতে পারেন।

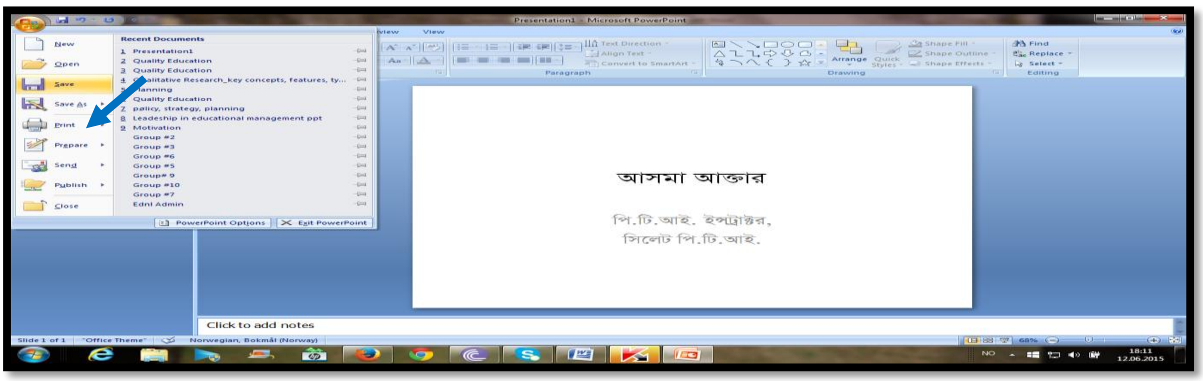

টেক্সট এর রং পরিবর্তন

- যে টেক্সটটি রং করবেন সেটি মাউস দিয়ে টেনে ধরে সিলেক্ট করুন।
- Home ট্যাবের ফন্ট কমান্ড গ্রুপে যেয়ে ফন্ট কালার নির্বাচন করুন। More Colors এ যেয়ে পছন্দমত রং নির্বাচন করুন।

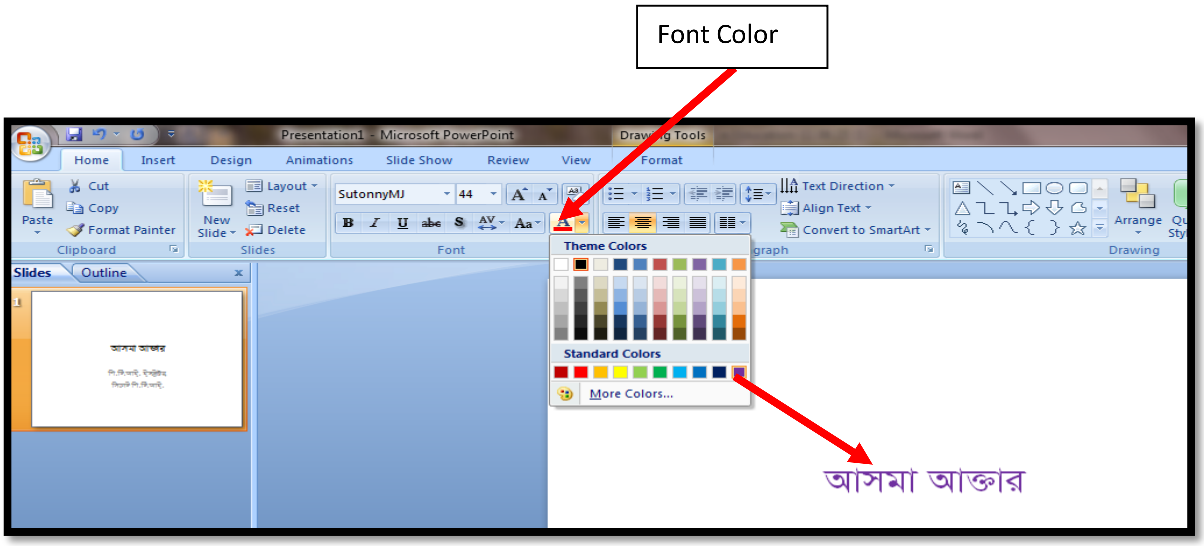

টেক্সট আউটলাইন রং করা

- টেক্সট আউটলাইনটি রং করার জন্য আগে টেক্সটটি সিলেক্ট করুন।
- এবার Home ট্যাবের Drawing কমান্ড গ্রুপে যেয়ে Shape Outline এ ক্লিক করুন। Theme color বা Standard Color থেকে রং নির্বাচন করুন। প্রয়োজনে More Colors এ যেয়ে পছন্দমত রং নির্বাচন করুন।

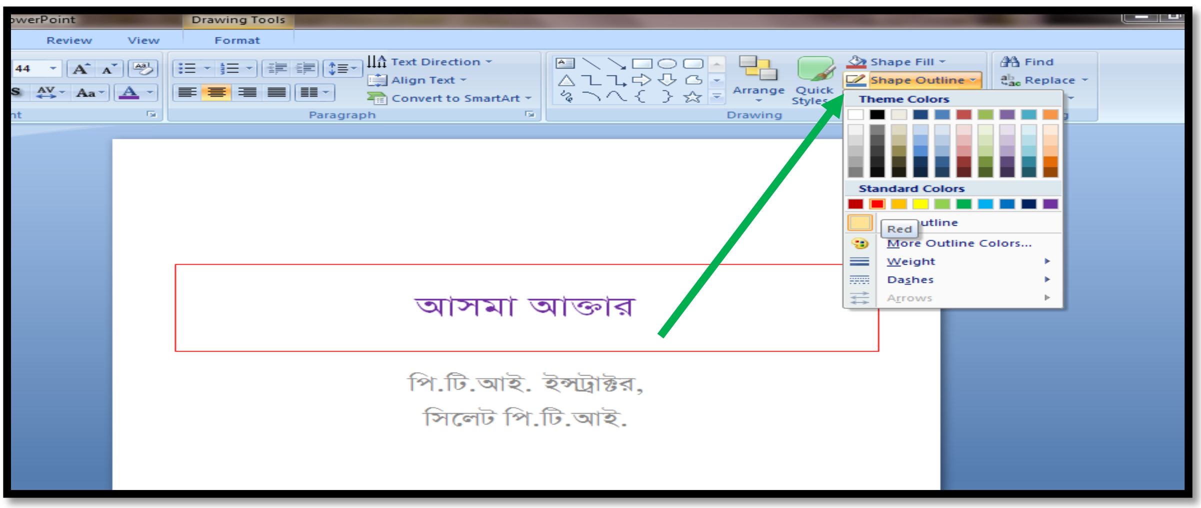

টেক্সট ছোট বা বড় করা

- টেক্সট ছোট বা বড় করতে হলে ফন্ট সাইজ ছোট বা বড় করতে হবে। টেক্সটটি সিলেক্ট করে ফন্ট কমান্ড বক্সের ফন্ট সাইজে যেয়ে এর পরিবর্তন করতে হবে।

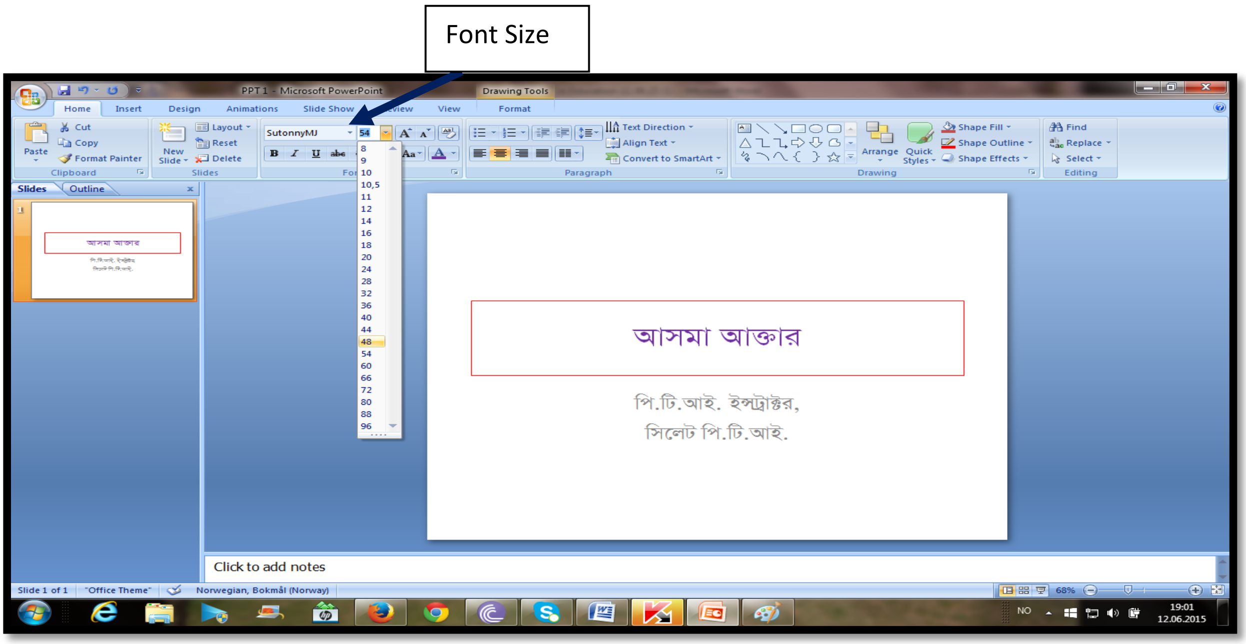

নতুন স্লাইড যোগ করা

- নতুন স্লাইড যোগ করতে হলে Slides কমান্ডের New Slide বাটনে ক্লিক করুন। সেখানে পছন্দমত স্লাইড লে-আউটও নির্বাচন করতে পারেন।

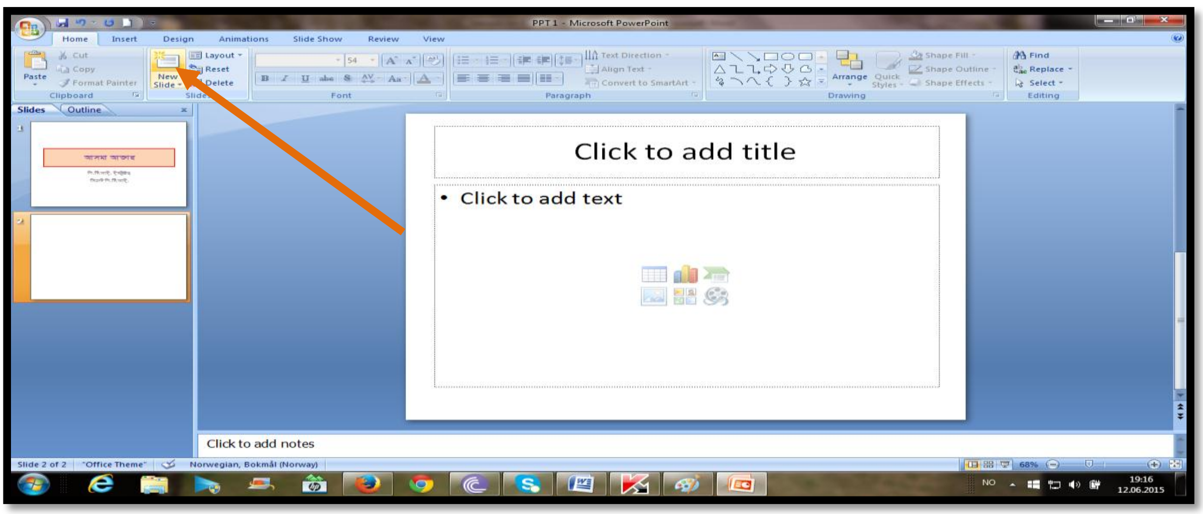

১. ৫.৩ স্লাইডে অবজেক্ট সংযোজন: টেবিল, ছবি, শেপ ইত্যাদি ইনসার্ট ও এডিট করা

- যে স্লাইডে ছবি ইনসার্ট করবেন সে স্লাইডটি আগে সিলেক্ট করুন। Working Window তে ঐ স্লাইডটি আসবে।
- এবার Insert ট্যাবে ক্লিক করে Illustrations কমান্ড বক্সের Pictureবাটনে ক্লিক করতে হবে।

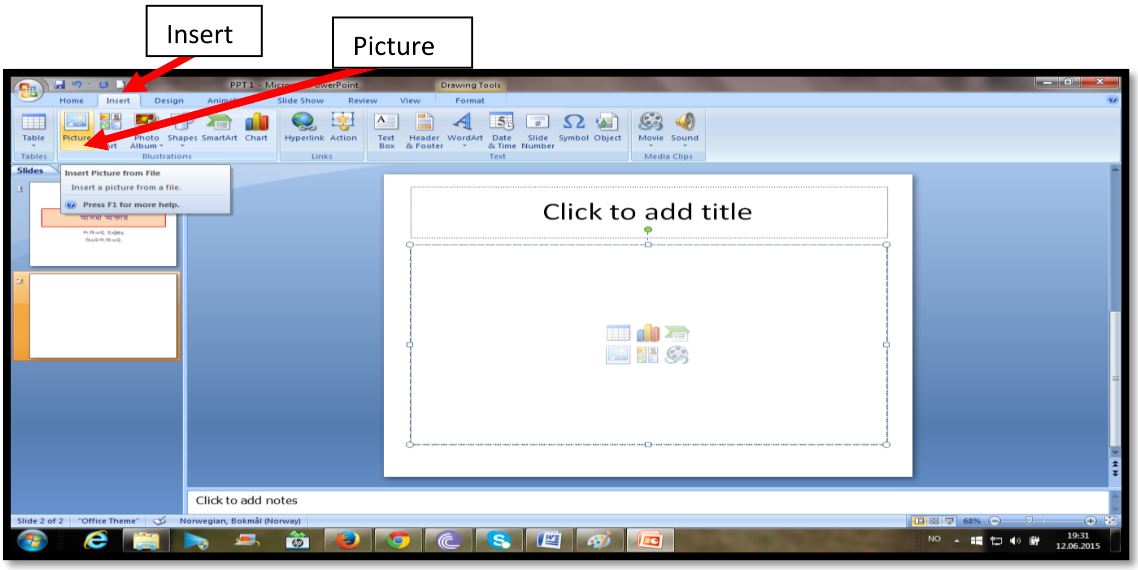

- যে ছবিটি ইনসার্ট করবেন সেটি যে ড্রাইভের যে ফোল্ডারে আছে সেখান থেকে ব্রাউজ করে বের করুন।
- এরপর ঐ নির্দিষ্ট ছবিটির উপর মাউস ক্লিক করে ছবিটি নির্বাচন করুন। এবার নিচের চিত্রের মত করে (তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে) Insert বাটনে ক্লিক করে স্লাইডে ছবিটি ইনসার্ট করুন।

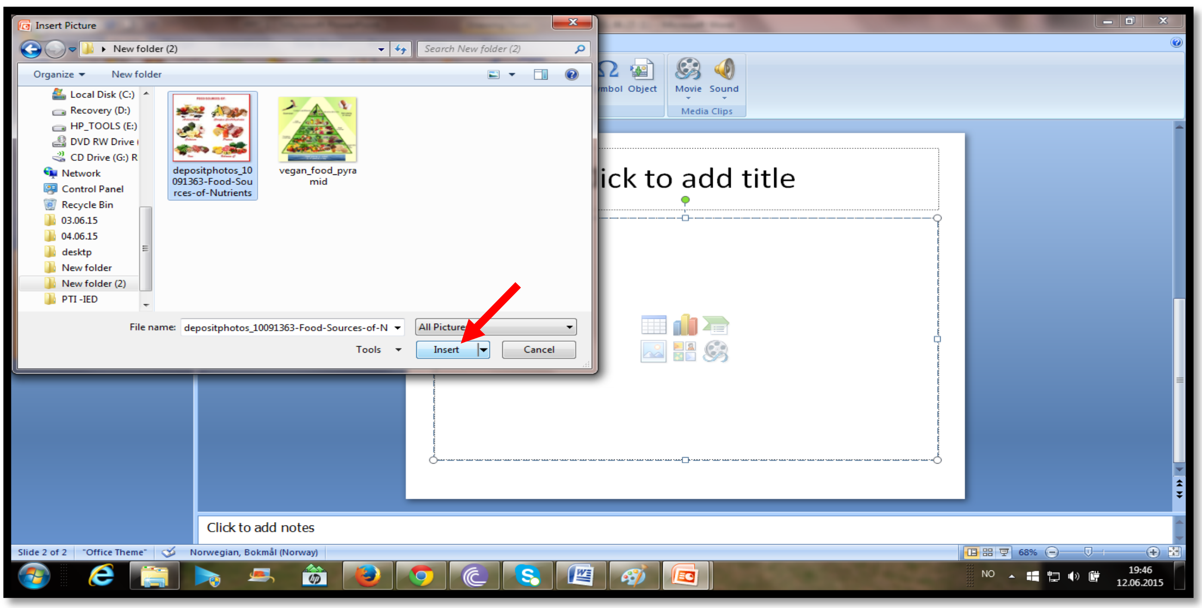

স্লাইডে ভিডিও ক্লিপ ও লিংক ইনসার্ট করা

- যে ভিডিও ক্লিপটি স্লাইডে ইনসার্ট করতে চান সেটি কোন ড্রাইভের কোন ফোল্ডারে আছে আগেই নিশ্চিত হয়ে নিন। প্রয়োজনে কাজের সুবিধার্থে ভিডিও ফাইলটি ডেস্কটপে একটি ফোল্ডারে স্থানান্তর করুন।
- Slides কমান্ডের New Slide বাটনে ক্লিক করুন। সেখানে স্লাইড লে-আউট থেকে ব্ল্যাংক স্লাইড নির্বাচন করুন।
- এখন Insert ট্যাবে ক্লিক করে Text কমান্ড বক্সের Object বাটনে ক্লিক করুন। Insert Object নামে একটি ডায়লগ বক্স আসবে।
- ডায়লগ বক্সে Create from file অপশনটি নির্বাচন করুন।
- এরপর ব্রাইজ বাটনে ক্লিক করুন। একটি পপ-আপ উইন্ডো দেখবেন।

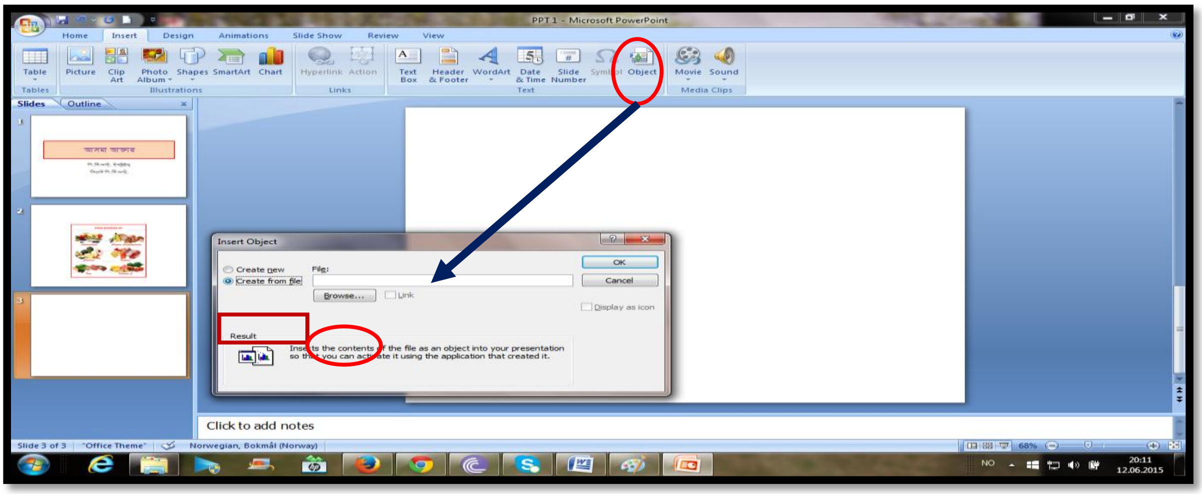

- এখন উইন্ডোটির বামে Desktop এ ক্লিক করে Food Video Clip ফোল্ডার ওপেন করে এর ভিতরের ফাইলটি ওপেন করুন। দেখবেন ডায়লগ বক্সে Create from file অপশনটির পাশের খালি ঘরে একটি লিংক এসেছে।

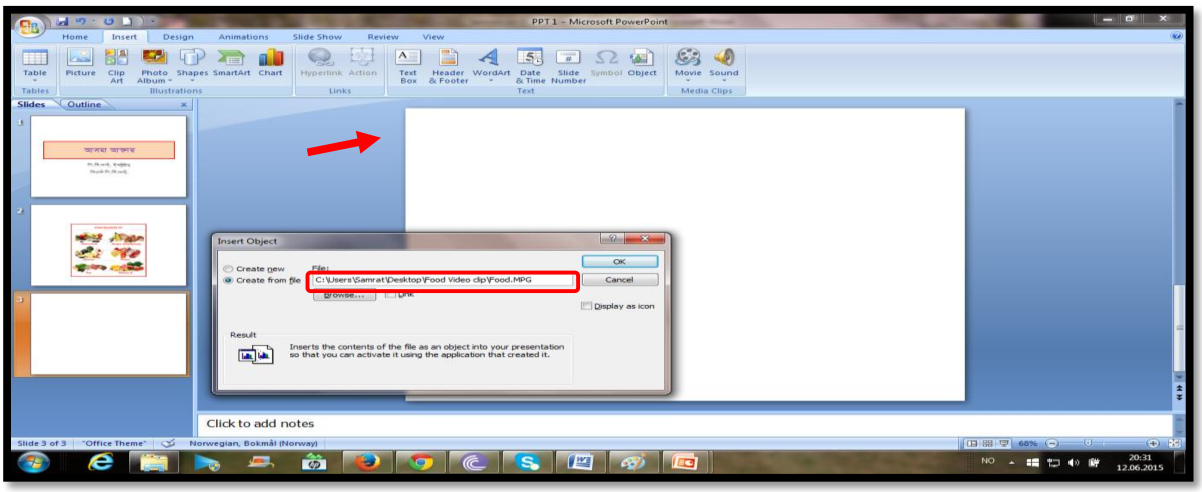

- এবার OK করুন। ভিডিও ক্লিপের সাইজ বড় হলে সময় একটু বেশি লাগবে। এরপর স্লাইডে একটি আইকন দেখতে পাবেন।

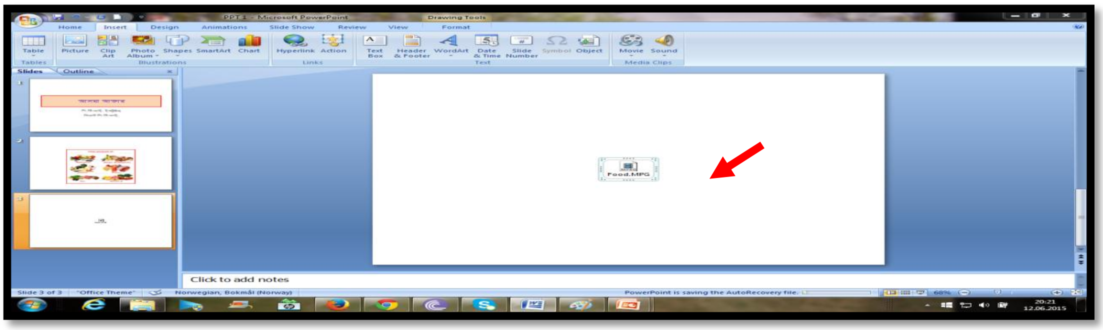

- স্লাইডে গিয়ে ঐ আইকনটি সিলেক্ট করুন। এখন Insert ট্যাবে ক্লিক করে Links কমান্ড বক্সের Action বাটনে ক্লিক করুন। Action Settings নামে একটি ডায়লগ বক্স আসবে।

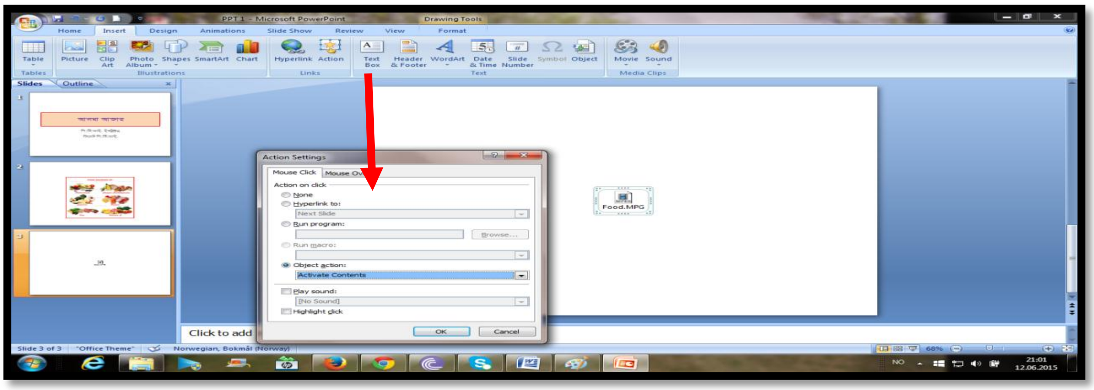

- **Object Action সিলেক্ট করে OK বাটনে ক্লিক করুন।**
- **স্লাইড শোতে যেয়ে ঐ স্লাইডের আইকনে ক্লিক করে ভিডিওটি দেখুন।**

টেমপ্লেট (Template) ব্যবহার

স্লাইড আকর্ষণীয় করতে টেমপ্লেট ব্যবহার করা যায়। টেমপ্লেট এর মাধ্যমে স্লাইডের ডিজাইন পরিবর্তন করা যায়। টেমপ্লেট পছন্দ করতে Design ট্যাব থেকে পছন্দ মতো টেমেপ্লেট সিলেক্ট করি।

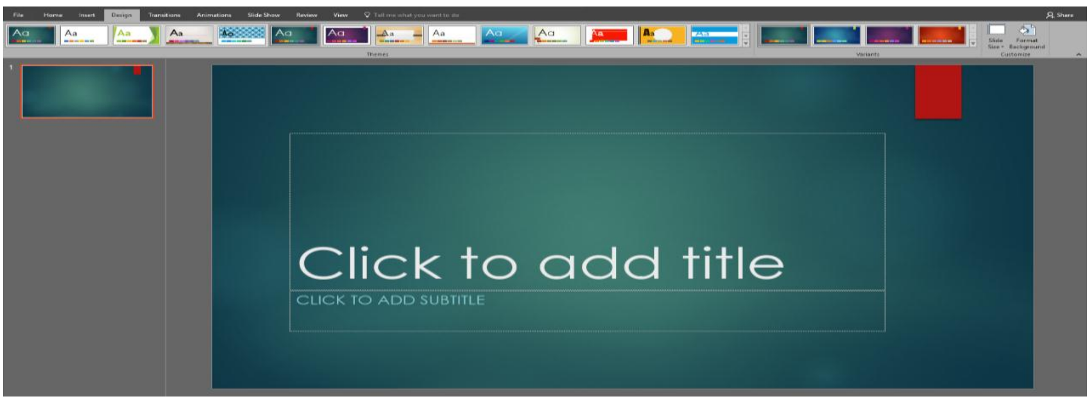

১.৬ শিখন শেখানো কার্যক্রম ও পেশাগত উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয়

১.৬.১ শ্রেণি শিখনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান স্থান হলো শ্রেণিকক্ষ। সাধারণত শ্রেণিকক্ষকে ভিত্তি করেই শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আধুনিক শ্রেণি ব্যবস্থাপনা এবং শ্রেণি শিখন ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে এবং প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। শ্রেণি ভিত্তিক শিখনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষাদান পদ্ধতি ও এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে বড় ভুমিকা রাখছে। নানা ভাবে শ্রেণি শিখনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার হয়ে থাকে বা হতে পারে। যেমন- শ্রেণিতে উপস্থিত পাঠ্য বিষয়ের আলোচ্য বিষয়টিকে দৃশ্যমান করা, ভিডিও দেখানো, অডিও শোনানোর কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে ভিডিও তথ্য চিত্র, ডিজিটাল উপস্থাপনা, অডিও উপকরণ তৈরি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া সম্ভব না। আবার শ্রেণিতে বসেই শিক্ষার্থীরা এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যম্যে পৃথিবীর জ্ঞান ও তথ্য ভান্ডারের সাথে পরিচিত হতে পারে। আর সেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হলো ইন্টারনেট বা অন্তর্জাল।

১.৬.২ ইন্টারএকটিভ কনটেন্ট/ই কনটেন্ট/ই-বুক এর উৎস ও ব্যবহার

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সংযোগ শিক্ষা ব্যবস্থার গতানুগতিক ধারণাকেই পাল্টে দিয়েছে। ফলে প্রতিদিন নতুন নতুন ধারণা যোগ হচ্ছে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সাথে। যেমন ইন্টারএকটিভ কনটেন্ট/ই-কনটেন্ট অথবা ই-বুক ইত্যাদি। এগুলোমূলত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা উপকরণ। শিক্ষা ব্যবস্থা এখন আর ছাপা বই এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ছাপা বই, লিফলেট, ভিডিও চিত্র, অডিও তথ্য, ছবি ইত্যাদি এখন আশ্রয় নিয়েছ ডিজিটাল ডিভাইসে আর এগুলোই হলো: ইন্টারঅ্যাকটিভ কনটেন্ট/ই কনটেন্ট/ই-বুক। এই ধরণের সকল উপকরণের উৎস এখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল ডিভাইস। ডিজিটাল ডিভাইস এর সাহায্যে এই সকল উপকরণগুলো শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং শিক্ষার গুণগত মানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের তথ্য ও জানার পরিধি বাড়ছে এবং শিখন সহজ ও আনন্দদায়ক হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (www.dpe.gov.bd), সেভ দ্যা চিলড্রেন (www.savethechildren.net), ব্র্যাক(www.brac.net) , digitalcontent.gov.bd কর্তৃক এরকম উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১.৬.৩ ডিজিটাল কনটেন্ট পরিচিতি, গুরুত্ব ও ব্যবহারের বিবেচ্য বিষয়

এক কথায় কনটেন্ট হচ্ছে কোন উপকরণ বা উপাদান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডিজিটাল কনটেন্ট কী? ডিজিটাল কনটেন্ট হলো সেই উপকরণ বা উপাদান যা ডিজিটাল ডিভাইসে সংরক্ষণ এবং এর মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। নানা ধরণের ডিজিটাল কনেটেন্ট রয়েছে। সেগুলো হলো অডিও, ভিডিও, লিখিত, পাওয়ার পয়েন্ট, ছবি ইত্যাদি। এগুলোর কোনটি ইন্টারঅ্যাকটিভ আবার কোনটি ননইন্টারঅ্যাকটিভ। যেমন ভিডিও, এ্যানিমেটেড এগুলো ইন্টারঅ্যাকটিভ অন্যদিকে টেক্সট, পাওয়ার পয়েন্ট,ছবি এগুলো নন ইন্টারঅ্যাকটিভ কনটেন্ট।আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ডিজিটাল কনটেন্ট এর গুরুত্ব অনেক। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে পৃথিবী আজ মানুষের হাতের মুঠোয় চলে

এসেছে। এই অবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এখানে ডিজিটাল কনটেন্ট এর ব্যবহার সময়ের দাবি। তাছাড়া ডিজিটাল কনটেন্ট এর ফলে শিক্ষা দান পদ্ধতির যেমন উন্নতি ঘটেছে তেমনি শিখন আনন্দময় ও সহজ হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষার নানা তথ্য ও উপাত্ত খুব সহজেই শ্রেণি কক্ষে বসেই শিক্ষার্থী পেতে পারছে আর এটা সম্ভব হয়েছে মূলত ডিজিটাল কনটেন্ট এর কারণে। শুধু তাই নয় এখন শিক্ষার্থীকে শ্রেণি কক্ষে বসে না থেকেও ক্লাস করার সুযোগ হচ্ছে শুধু ডিজিটাল কনটেন্ট এর কারণে। এছাড়াও শিক্ষার্থী যখন ইচ্ছা এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসেই শিখতে পারছে। মোট কথা ঘরে বসেই পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে এই ডিজিটাল কনটেন্ট এর ফলে। তবে ডিজিটাল কনটেন্ট এর ব্যবহারে ক্ষেত্রে কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আর সেগুলো হলো সঠিক তথ্য উপাত্ত সমৃদ্ধ কনটেন্ট কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। কনটেন্ট তৈরি বা ব্যবহারের সময় ভুল বা অসত্য তথ্য যেন না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারের পূর্বে ডিজিটাল ডিভাইসটি ঠিক আছে কিনা তা ভালো করে পরীক্ষা করতে হবে এবং এর জন্য প্রযোজনীয় সাপোর্ট যেমন বিদ্যুৎ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর ব্যবস্থা আছে কি না তা বিবেচনায় রাখতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের A2i প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক কর্তৃক উন্নয়নকৃত ডিজিটাল কনটেন্ট এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়-www.teachers.gov.bd

১.৬.৪ ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি (ইন্টারেক্টিভ, এনিমেটেড, ইনোভেটিভ)

পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেসকল উপকরণ বা উপাদান ডিজিটাল ডিভাইসে তৈরি, ধারণ এবং ব্যবহার করা হয় সেগুলোই মূলত ডিজিটাল কনটেন্ট। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে ডিজিটাল ডিভাইস এর ভূমিকা রয়েছে। একথায় ডিজিটাল ডিভাইস ছাড়া ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা অসম্ভব। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সাক্ষরতা ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির জন্য অপরিহার্য শর্ত। ডিজিটাল ডিভাইস সাক্ষর বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সাক্ষর ব্যক্তি খুব সহজেই ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি ও ব্যবহার করতে পারেন। নানা ধরণের ডিজিটিাল কনটেন্ট রয়েছে এর মধ্যে ইন্টারএ্যাকটিভ, এনিমেটেড কিংবা ইনোভেটিভ যে কনটেন্ট এর কথাই বলি না কেন এগুলো তৈরির জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সাক্ষরতার পাশাপাশি ডিজিটাল ডিভাইস সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান বা দক্ষতা যেমন বিশেষ বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহারের ক্ষমতা বা সাক্ষরতা থাকতে হবে। যেমন ভিডিও তৈরির জন্য এক ধরণের সফটওয়্যার আবার এনিমেটেড কনটেন্ট এর জন্য অন্য ধরণের সফটওয়্যার সম্পর্কে জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। ডিজিটাল কনটেন্ট এর বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। সেগুলো হলো:

- ✓ অপেক্ষাকৃত সস্তা ও টেকসই
- ✓ বারংবার ব্যবহার উপযোগী
- ✓ সহজে বহন ও সংরক্ষণ যোগ্য
- ✓ আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন
- ✓ শিখন সহায়ক

১.৬.৫ পেশাগত উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অন্তর্ভূক্তিকরণ

আজ যে শিক্ষার্থী কাল সে পেশাজীবী। জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই উৎকর্ষের যুগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ছাড়া কি একটি দিন কল্পনা করা যায়? তা যদি না যায় তাহলে শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অর্ন্তভুক্তি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কেননা আজ যে বা যিনি শিক্ষার্থী কাল সে পেশাগত জীবনে প্রবেশ করবে; তখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সাক্ষরতা ছাড়া কি তার পক্ষে যোগ্যকর্মী বা পেশাজীবী হওয়া সম্ভব হবে? সমকালীন বাস্তবতায় আজ সকল ধরণের পেশায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রবেশ ঘটেছে। ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে বলেই ধারণা। বর্তমানে এমন কোন পেশা খুজে পাওয়া কঠিন হবে যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নেই। ধরা যাক একজন সাধারণ দোকানের সেলস্ ম্যান এর কাজ করেন। প্রশ্ন হচ্ছে তার পেশাগত উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কি প্রভাব রয়েছে। আমরা যদি বাস্তবতার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে দোকানের বিক্রয়কর্মী পেশার ক্ষেত্রেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রযোজনীয়তা রয়েছে। একসময় যে কাজগুলো এনালগ সিস্টেমে করা হতো এখন সেই কাজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠেছে তাতে সময় কম লাগছে আবার ভুল হবার সম্ভাবনা কমে গেছে। যেমন বিক্রয়কর্মী যেখানে বিক্রয় শেষে খাতায় লিখে সারাদিনের হিসাব করতেন আজ কি পরিমান বিক্রয় হয়েছে এখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ফলে তা সাথে সাথেই সম্পন্ন করা যাচ্ছে ফলে এতে করে কর্মীর সময় বেচে যাচ্ছে অন্যদিকে কর্মক্ষমতা বা দক্ষতাও বৃদ্ধি পয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সাক্ষরতা থাকার কারণে। অন্যান্য যে কোন পেশার ক্ষেত্রে একই ভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সেক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জানা বা সাক্ষর ব্যক্তিগণই উপযুক্ত ও দক্ষ পেশাজীবী হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই বিষয় হিসেবে শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি পাশাপাশি শিক্ষার মান উন্নয়ন ও জ্ঞানার্জন সহজীকরণের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি সময় উপযোগী এবং যৌক্তিক পদক্ষেপ।

১.৭ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট ইস্যুসমুহ

১.৭.১ ব্যক্তিগত ইস্যু

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুফল অনেক বেশি হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সময় ব্যক্তিগত কিছু সমস্যা তৈরি হতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইস্যুগুলো নিম্নরূপ:

- স্বাস্থ্যগত ইস্যু: যেমন কম্পিউটার মনিটর বা স্ক্রীনের সামনে অতিরিক্ত সময় ধরে কাজ করলে চোখের সমস্যা হতে পারে। অনেক সময় ঘাড়ে ও পেশিতে ব্যথা হতে পারে। কম্পিউটার বা স্ক্রীনের সামনে এমন ভাবে বসার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে অন্তত ৯০ ডিগ্রী বরাবর চোখের অবস্থান থাকে মনিটর বা স্ক্রীন থেকে। একাধারে বেশিক্ষণ কাজ না করে অন্তত দুই ঘন্টা পর পনের (১৫) মিনিট বিরতি নেয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

- Electromagnetic Radiation (EMR): তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ডিভাইস বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে এক ধরণের Electromagnetic Radiation (EMR) বা তড়িত চৌম্বক বিকিরণ এর উৎপত্তি হয় যা মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর। ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখিত সমস্যার কথা মাথায় রেখে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ। সাধারণ ভাবে মনিটর বা স্ক্রীন থেকে যাতে অতিরিক্ত আলো বের হয়ে চোখে না লাগে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঘরে বা যেখানে বসে কাজ করা হয় সেখানে যেন যথেষ্ট আলো থাকে। সম্ভব হলে মনিটরের উপরে প্রটেকটর ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফলে দেখা যাচ্ছে যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলে প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

১.৭.২ পারিবারিক ইস্যু

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পারিবারিক ইস্যু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একদিকে যেমন এর ফলে পরিবার লাভবান হচ্ছে অন্যদিকে পারিবারিক শৃঙ্খলা বা সৌন্দর্য ঝুকির মধ্যে পড়তে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে পারিবারিক যে সকল ইস্যু রেয়েছে সেগুলো হলো:

- কেউ কেউ প্রযুক্তি নির্ভর গেইম এ আসক্ত হতে পারেন তাতে পরিবার এবং ব্যক্তি উভয়ই সংকটে পড়তে পারেন।
- ইন্টারনেট বা অন্তর্জালে আড্ডার আসক্তি পারিবারিক শান্তি নষ্ট করতে পারে। ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটির বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।
- ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা নষ্ট হতে পারে।
- পর্ণগ্রাফি: এটি পারিবারিক ইস্যুর মধ্যে পড়ে।

১. ৭.৩ সামাজিক ইস্যু

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ইস্যুগুলোও সামাজিক ইস্যুর মধ্যে পড়ে। এগুলোর বাইরেও আরো কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো সামাজিক ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত। সেগুলো হলো:

- জালানি খরচ কমাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সহায়ক পালন করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি অফিস এবং কারখানার উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।
- শিল্প কল কারখানায় অপচয় রোধে সহায়ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় অধিক পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে অল্প কর্মীর দ্বারা। এটির আবার দুটো দিক রয়েছে।প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদনের কারণে যেমন উৎপাদন বাড়ছে তেমনি প্রযুক্তিগতভাবে অদক্ষ শ্রমিকরা চাহিদা হারাচ্ছে।
- পরিবেশ রক্ষা বিশেষ করে বৃক্ষ নিধন কমাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সহায়কের কাজ করছে। অনেক

অফিস আছে যেখানে আর কাগজ ব্যবহার হচ্ছে না। তারা EDI সিস্টেম চালু করেছে। ফলে কাগজের জন্য যে গাছ কাটা হতো তা কমে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে। পৃথিবীকে জলবায়ু ঝুঁকির হাত থেকে মুক্ত রাখতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান আছে।

- পরিবেশ দূষণ রোধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান অনেক। অনেক অফিস আছে যেখানে ঘরে বসেই অফিস করা যায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে। ফলে রাস্তায় কম গাড়ি চলছে ফলে ট্রাফিক জ্যাম যেমন কমছে অন্যদিকে কম জালানী পুড়ছে যা সব দিক দিয়ে পরিবেশ দূষণ রোধে ভূমিকা রাখছে।

১. ৭.৪ অর্থনৈতিক ইস্যু

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অর্থনৈতিক ইস্যুর ফলাফল ব্যাপক। বলতে গেলে পৃথিবীর অর্থনৈতিক চাকা আমূল বদলে দিয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। বর্তমান পৃথিবীতে যে কয়জন সব চেয়ে ধনী তাদের বেশির ভাগ ধনী হয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে নির্ভর করে। কেউ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদন করে আবার কেউ হয়েছেন এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে। যেমন মাইক্রোসফট, গুগল, ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতাগণ মূলত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদন করেছেন এবং বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের অন্যতম । তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অর্থনৈতিক ইস্যু সব শ্রেণি পেশার মানুষের কাছে পৌঁছেছে। কেউ যেমন চাকরী হারাচ্ছেন অন্যদিকে কারোর ভাগ্যেও চাকা ঘুরে যাচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ফলে। তবে অর্থনৈতিক ইস্যু বিচারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নেতিবাচক ইস্যুর তুলনায় ইতিবাচক ইস্যুই বেশি। পণ্য ক্রয় বিক্রয় বা অর্থ লেন দেন যা কিছু ইচ্ছা তা আজ ঘরে বসেই করা সম্ভব হচ্ছে শুধু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে।

১. ৭.৫ নৈতিক ইস্যু

সাধারণ অর্থে যে কোন বস্তু বা বিষয়ের কিছু নৈতিক ও কিছু অনৈতিক ইস্যু থাকে। তেমনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কিছু নৈতিক এবং অনৈতিক ইস্যু রয়েছে। সেগুলো হলো-

- সফটওয়ার চুরি বা পাইরেটেড সফটওয়ার ব্যবহার হচ্ছে হরদম
- হ্যাকিং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনৈতিক ইস্যু
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির ফলে যেমননতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে তেমনি অনেক প্রযুক্তিবিমূখ মানুষ তাদেও কর্মসংস্থান হারাচ্ছে
- ব্যক্তির গোপনীয়তা বলে কিছু থাকছে না
- ভুল বা উসকানীমূলক তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট এবং সম্প্রদায়গত সংঘাতের জন্ম হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে
- অবৈধ পর্ণগ্রাফির মাধ্যমে ব্যক্তির বা সমাজের সম্মান হানি ঘটছে এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ফলে।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর বাইরেও আরো নানা ধরণে নৈতিক প্রশ্ন উঠছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিক বিষয়গুলো মাথায় রেখে ব্যবহার করা উচিৎ

১. ৭.৬ ব্যবস্থাপনা ইস্যু

বর্তমান সময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানব জীবনের নিত্য সঙ্গী। এর ব্যবহার বলতে গেলে সর্বত্র। জীবন গড়তে বা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যেমন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে তেমনি জীবন বাঁচাতেও নানা ধরণের স্বাস্থ্যগত সমস্যা পরীক্ষা নিরীক্ষায় এর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ফলে শিক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্যসহ নানাবিধ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। আমরা যদি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করি তাহলে দেখতে পায় যে, শিক্ষার্থীদের তথ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, পরীক্ষার ফলাফল তৈরি এবং প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যুগান্তরকারী পরিবর্তন সাধন করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপকতর প্রয়োগের পূর্বে বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশে ব্যাপক সময় ও লোকবল প্রয়োজন হতো। অথচ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির ফলে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণের দুই/এক দিন বা ক্ষেত্র বিশেষে কয়েক ঘন্টার মধ্যেও ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে । তথ্য সংরক্ষণ এবং শ্রেণিকরণ এর ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ইস্যুটি অপরিহার্য। মূলত বর্তমান সময়ে জীবন পরিচালনা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইস্যুটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিনত হয়েছে।

১.৭.৭ সাইবার বুলিং

সাইবার বুলিং হচ্ছে অনলাইনে কোনো শিশুকে প্রলুব্ধ বা হেয় প্রতিপন্ন করা, ভয় দেখানো এবং মানসিক নির্যাতন করা। শুরুতে কিশোর-কিশোরীরাই কেবল এ ধরনের কাজে জড়িত থাকে ভেবে বুলিং সংজ্ঞায়িত করা হলেও পরে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে স্বনামে বা ফেক আইডির আড়ালে প্রাপ্তবয়স্ক অনেকেও এ ধরনের হীন কাজে জড়িত থাকে। সাইবার বুলিংয়ের ঘটনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ঘটলেও ফোনে কিংবা ইমেইলেও অনেক সময় এ ধরনের নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকে। সাইবার বুলিং-এর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বেশিরভাগই শত্রুভাবাপন্ন, বিরূপ মন্তব্য এবং অনলাইনে অবমাননাকর উক্তি জাতীয় সাইবার বুলিং-এর শিকার হয়েছে। সাইবার বুলিংয়ের কোনো সূত্র পাওয়া গেলে বা এ ধরনের ঘটনা একবার ঘটলে বিকৃত ও অসুস্থ মানসিকতার আরো অনেকের কাছে আক্রান্ত ব্যক্তির খোঁজ বা যোগাযোগের তথ্য চলে যায় বলে ধীরে ধীরে এর মাত্রা বাড়তেই থাকে। এর ক্রমবর্ধমান চাপে শিশুর মাঝে হতাশা,লেখাপড়ার প্রতি অনীহা, ইনসমনিয়া থেকে শুরু করে আত্মহত্যার প্রবণতা পর্যন্ত তৈরি হতে পারে। শিশুদের অনেকেই এসময় ভয় পেয়ে বা 'চুপ করে থাকলে একসময় ঠিক হয়ে যাবে' ভেবে মুখ খুলে না। আর সাইবার বুলিং-এ জড়িতরা এর সুযোগ নেয় আরও বেশি করে। অন্যান্য সাইবার বুলারদের সাথে নিয়ে তারা ভিক্টিমকে আরও বেশি করে নির্যাতন করে।

সাইবার বুলিং প্রতিহত করতে করণীয়সমূহ

সাইবার বুলিং প্রতিরোধে এ বিষয়ে মা-বাবার ধারণা থাকা, সন্তান ইন্টারনেটে (কম্পিউটার এবং মোবাইলে) কী করছে তা জানা এবং সন্তানদের সাথে বন্ধুসুলভ সুসম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য মতে, দেশের তিন-চতুর্থাংশ নারীই সাইবার নিপীড়নের শিকার। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের হিসাবে এদের মধ্যে মাত্র ২৬ শতাংশ অনলাইনে হেনস্থার বিষয়টি প্রকাশ্যে এনে অভিযোগ করে এবং অন্যরা সামাজিকতার ভয়ে গোপন রাখে। সন্তানদের সাথে সাইবার বুলিং নিয়ে আলোচনা করেন। কিভাবে এবং কোন চ্যানেলের মাধ্যমে অনলাইনে অশোভন কার্যক্রম ঘটতে পারে, কিভাবে এটা সংঘটিত হয় এবং কিভাবে এর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে হয়, এসব শিশুদের বোঝানোর প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে আলোচনা করা।

১.৭.৮ সাইবার ক্রাইম

সাইবার ক্রাইম" বলতে ইন্টারনেট ব্যবহার করে যে অপরাধ করা হয়, তাকেই বোঝানো হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি যে কোন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বা ডিজিটাল ডিভাইসও ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে কোন কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা নেটওয়ার্কের মালিক বা জিম্মাদারের অনুমতি ব্যতীত উক্ত সিস্টেম বা নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে অনিষ্ট সাধন করে, ভাইরাস প্রবেশ করায়, কম্পিউটার তথ্য ভান্ডারের ক্ষতি সাধন করে,সব সোর্স কোড পরিবর্তন করে,সিস্টেমের হ্যাকিং করে, ইলেক্ট্রনিক বা ইন্টারনেট মাধ্যমে মিথ্যা, অশ্লীল বা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ করে, সংক্ষরিত সিস্টেমে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করে, তথ্য চুরি, তথ্য বিকৃতি প্রতারণা, ব্লাকমেইল,অর্থ চুরি,ব্যাংকিং ডাটাবেজে প্রবেশ অর্থ ট্রান্সফার ইত্যাদি অপরাধ করে তবে তাকে সাইবার ক্রাইম বা সাইবার অপরাধ বলে । বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত কয়েকটি সাইবার ক্রাইম হলো-

- সাইবার পর্ণোগ্রাফী
- হ্যাকিং
- স্প্যামিং বা জাঙ্ক মেইল
- ম্যালওয়্যার
- এ্যাকশান গেম
- স্লাইফার
- ক্লিক ফ্রড

১.৭.৯ সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০১৫ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন ২০১৩

বর্তমানে আমরা সাইবার সভ্যতার যুগে বাস করছি। এই সভ্যতার মূলে রয়েছে আইসিটি, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইমেইল, আপলোড, ডাউনলোড ইত্যাদি। তা ছাড়া রয়েছে নানা ধরনের ওয়েব সাইট বা পোর্টাল। রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম। এসবের ব্যবহার আজকের দিনে অতিশয় জনপ্রিয় হয়ে পড়েছে। আজকাল

আমরা আইসিটির ব্যবহার ছাড়া একদিনও চলতে পারি না। এই অতি প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি আইসিটি এর অপব্যবহারও হচ্ছে দিন দিন। এতে ঘটছে নানা অনাকাঙ্খিত ঘটনা। বিব্রত হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র। এসব নিয়ন্ত্রনে গ্রহণ করতে হচ্ছে নানা কাঙ্খিত-অনাকাঙ্খিত পদক্ষেপ। চারপাশে আইসিটি ব্যবহারকারীরা সংঘটিত করছেন নানা ধরণের সাইবারবুলিং, সাইবারক্রাইম। সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০১৫ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন ২০১৩ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন ২০১৩ ও সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০১৫

এর উল্লেখযোগ্য ধারা সমূহ নিম্নরূপঃ

পর্নোগ্রাফী, শিশু পর্নোগ্রাফী এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ	*ধারা-১৫ ।(১) কোন ব্যক্তি-* (ক) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফী বা অশ্লীল উপাদান প্রকাশ করিলে; বা (খ) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে প্রকাশনার উদ্দেশ্যে পর্নোগ্রাফী বা অশ্লীল উপাদান উৎপাদন করিলে; বা (গ) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটারের স্থানান্তরযোগ্য সংরক্ষণ *ব্যবস্থায় রক্ষিত বা জমাকৃত তথ্য (*removable storage medium*) পর্নোগ্রাফী বা অশ্লীল উপাদান সংরক্ষণ করিলে; বা* (ঘ) এমন কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে বা প্রকাশ করিবার কারণ ঘটাইলে যাহাতে বিজ্ঞাপনদাতা কর্তৃক পর্নোগ্রাফী বা অশ্লীল উপাদানসমূহ বিতরণ বা প্রদর্শন করিবার সম্ভাবনা থাকে; বা (ঙ) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফী বা অশ্লীল উপাদানে প্রবেশ করিলে; (২) কোন ব্যক্তি- (ক) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে শিশু পর্নোগ্রাফী বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদান প্রকাশ করিলে; বা (খ) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে প্রকাশনার উদ্দেশ্যে শিশু পর্নোগ্রাফী বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদান উৎপাদন করিলে; বা (গ) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটারের স্থানান্তরযোগ্য সংরক্ষণ *ব্যবস্থায় রক্ষিত বা জমাকৃত তথ্য (*removable storage medium*) শিশু* পর্নোগ্রাফী বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদান সংরক্ষণ করিলে; বা (ঘ) এমন কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে বা প্রকাশ করিবার কারণ ঘটাইলে যাহাতে

	বিজ্ঞাপনদাতা কর্তৃক শিশু পর্নোগ্রাফী বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদানসমূহ বিতরণ বা প্রদর্শন করিবার সম্ভাবনা থাকে; বা *(ঙ)* কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে শিশু পর্নোগ্রাফী বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদানে প্রবেশ করিলে; তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি পর্নোগ্রাফী বা শিশু পর্নোগ্রাফী সংঘটনের অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
	(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর *কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন*| *(৪)* যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দন্ডে দ্নডিত হইবেন।
কম্পিউটারের সাধারণ *ব্যবহার ব্যাহত না করা*	*ধারা*-২২। (১) নিয়ন্ত্রক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তা যে বা যাহারা এই আইনের অধীন তদন্তের জন্য অনুসন্ধান, পরিদর্শন অথবা অন্য যাহা কিছু করে, তাহা এমনভাবে পরিচালিত হইবে যে কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইহার কোন অংশের বৈধ ব্যবহার যেন এই ধরনের অনুসন্ধান, পরিদর্শন তদন্তের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইহার কোন অংশ জব্দ করা যাইবে না, যদি না-
	ক) যে স্থানে এই কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইহার কোন অংশ আছে সেই স্থানে পরিদর্শন সম্ভব না হয়। খ) এই ধরনের কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা *ইহার কোন অংশ অপরাধ প্রতিরোধ করিবার জন্য বা চলমান অপরাধ রোধ* করার জন্য জব্দ করার প্রয়োজনীয়তা আছে বা বাজেয়াপ্ত না করিলে তথ্য-উপাত্ত *নষ্ট, ধ্বংস, পরিবর্তন অথবা প্রাপ্যতা দুষ্কর হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকিয়া যায়।*
অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা	*ধারা-২৮। এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ* *(ক) ধারা ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩,১৪, ১৫, ও ১৬ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য* (Cognizable) *ও অ-জামিনযোগ্য হইবে; এবং* *(খ) ধারা ২৪ ও ২৫ এ* উল্লিখিত *অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (*non-cognizable*) ও জামিনযোগ্য হইবে।*
জামিন সংক্রান্ত	*ধারা-২৯। বিচারক এই আইনের অধীন দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি প্রদান করিবেন না, যদি না-*

বিধান	(ক) রাষ্ট্রপক্ষকে অনুরূপ জামিনের আদেশের উপর শুনানীর সুযোগ প্রদান করা হয়; (খ) বিচারক সন্তুষ্ট হন যে,- (অ) অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারে দোষী সাব্যস্ত নাও হইতে পারেন মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে; (আ) অপরাধ আপেক্ষিক অর্থে গুরুতর নহে এবং অপরাধ প্রমাণিত হইলেও শাস্তি কঠোর হইবে না; এবং *(গ) তিনি অনুরূপ সন্তুষ্টির কারণসমূহ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন।*
বাজেয়াপ্তি	*ধারা-৩০।*(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, যে কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি, কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সিডি), টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণ বা বস্তু সম্পর্কে বা সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেইগুলি উক্ত অপরাধের বিচারকারী আদালতের আদেশানুসারে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
	(২) যদি আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তির দখল বা নিয়ন্ত্রণে উক্ত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণ পাওয়া গিয়াছে তিনি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধান লংঘনের জন্য বা অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী নহেন, তাহা হইলে উক্ত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণ বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে না। (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণের সহিত কোন বৈধ কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোন কম্পিউটার উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেইগুলিও বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।
	(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত *কোন অপরাধ* সংঘটনের জন্য যদি কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের কোন কম্পিউটার বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন উপকরণ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে উহা বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে না।
ষষ্ঠঅধ্যায়	
আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা	
ধারা-৩১। এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে অনুসন্ধান, প্রসিকিউশন এবং বিচারিক কার্যক্রম	

পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নে অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪ নং আইন) এর সমস্ত বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে।

সপ্তম অধ্যায় *বিবিধ*

ধারা-৩২। এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, নিয়ন্ত্রক, ডেপুটি কন্ট্রোলার, সহকারী কন্ট্রোলার বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত *কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।*

ধারা-৩৩।(১) এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে উক্ত বিধানে কোন অস্পষ্টতার কারণে অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে সরকারী *গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।*

(২) এই ধারার অধীন প্রত্যেক আদেশ জাতীয় সংসদে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপ*স্থাপন করিতে হইবে।*

ধারা-৩৪।১) সরকার এই আইন পাস করিবার পরমূহূর্তে একটি কমিটি গঠন করিবে যাহা সাইবার আইন উপদেষ্টা কমিটি নামে পরিচিত হইবে;

২) সরকার, প্রয়োজন অনুসারে, সাইবার আইন উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি এবং নির্দিষ্ট পরিমান অন্যান্য সদস্য বা পদাধিকার সংক্রান্ত সদস্য নিয়োগ করিবে যাহারা সাইবার নিরাপত্তা বা সাইবার আইনের বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হবে। ৩) সাইবার আইন উপদেষ্টা কমিটি উপদেশ প্রদান করিবে যাহা:

ক) সাইবার নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করার জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই আইনের সহিত সম্পৃক্ত করিতে পারে;

খ) বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন ও প্রসারের সাথে সাথে ডিজিটাল সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় যথেষ্ট হয় এমন বিধান সংযোজন করিতে পারে;

গ) এই আইনের অধীন নিয়ন্ত্রককে বিধি প্রণয়ন করিতে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবেন।

৪) সরকার, প্রয়োজনমতে, অপদাধিকার সংক্রান্ত কমিটির সদস্যদের এই উদ্দেশ্যে *যাতায়াতের খরচাদি এবং অন্যান্য ভাতা নির্ধারণ করিবেন।*

ধারা-৩৫ । সরকার, সরকারি গেজেটে এবং তদতিরিক্ত ঐচ্ছিকভাবে ইলেক্ট্রনিক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-

ক) ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা;

খ) কন্ট্রোলার কর্তৃক ফরেনসিক ল্যাব পরিচালিত করা;

গ) ট্রাফিক ডাটা অথবা তথ্য পর্যালচনা অথবা সংগ্রহের পদ্ধতিসমূহ এবং রক্ষা পদ্ধতি;

ঘ) হস্তক্ষেপ, পর্যালোচনা অথবা ডিক্রিপশন পদ্ধতি এবং রক্ষা;

ঙ) সংকটাপন্ন তথ্য পরিকাঠামো নিরাপত্তা;

চ) আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার পদ্ধতি।
ধারা-৩৬। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, *এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (*Authentic English Text*) প্রকাশ করিবে।* *(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।*

তথ্যপুঞ্জি:

Rahman, M. L., Hossain, M. A., Computer Fundamentals, Systech Publication, Dhaka.Norton, P., Introduction to Computers, McGraw-Hill Publications.

Walkenbach, J., Wempen , F., Alexander , M., Kuseika ,D. Microsoft Office 2013 Bible, WilleyMelton, B., Dodge, M., Swinford, E. (2013). Step By Step Microsoft Office Professional 2013, MS Press.

Banu, S., Computer and Internet: their Educational Uses, Papyrus, Dhaka

Related Websites

গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা

অধ্যায় ২

শিক্ষা ও গ্রন্থাগার

শিক্ষায় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও ভূমিকা

শিক্ষা একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সাধারণ অর্থে স্কুল কলেজে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি অনুযায়ী লেখা পড়া করে বিদ্যা অর্জন করাকে শিক্ষা বলে। আসলে এগুলো শিক্ষা লাভের সহায়ক মাত্র। শিক্ষা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া বিশেষ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে মানসিক ও দৈহিক উন্নতি সাধনই শিক্ষা।

শিক্ষা ব্যক্তির সুপ্ত গুণাবলী ও সহজাত শক্তিসমূহের বিকাশ ঘটায়, ব্যক্তি জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্য বয়ে আনে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সমষ্টিগতভাবে আয়োজিত কর্মকান্ডকে সাধ্যমত অবদান রাখতে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। অপূর্ণ শিক্ষা ব্যক্তি, সমাজ তথা জাতির কোন উপকারে আসে না।

শিক্ষা ব্যক্তির কল্যাণ সাধন, ব্যক্তির বিকাশ ও তাত্ত্বিক উন্নতি সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য।

আসলে মানব সম্পদের ধারণাটি হলো কোন মানুষের মধ্যে বিবিধ বিরল গুণের সমাহার। কেননা সব মানুষই মানুষ হয়ে জন্মায় এবং পরবর্তীতে নানাবিধ অর্জনের মাধ্যমে পরিণত হয় সম্পদে। আর এই বিবিধ অর্জনের মূল অংশ হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের দৃষ্টি খুলে দেয়। শিক্ষিত মানুষ নিজের শক্তি ও সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পারে। শিক্ষা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী, কর্মক্ষম, সুশৃঙ্খল উদ্যোগী এবং চিন্তাশীল করে তোলে। তাই মানুষকে সম্পদে পরিণত করতে হলে শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ আবশ্যক।

একটি জাতি উন্নত কী অনুন্নত তার মানদন্ড হচ্ছে শিক্ষা। যুগে যুগে যে জাতি যত শিক্ষার আলো পেয়েছে সে জাতি তত উন্নত জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমান বিশ্বে উন্নত জাতিগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, তারা শিক্ষায়ও উন্নত। এসব দেশের রয়েছে উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষার গুণগত মান অর্জিত না হলে সে শিক্ষার মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হলেও তা জনসম্পদে পরিণত হয় না।

শিক্ষার এই গুণগতমান অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো গ্রন্থাগার। আমাদের দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে গ্রন্থাগার সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে শিক্ষার গুণগত মান অনেকাংশেই অর্জিত হচ্ছে না এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠাভ্যাসও গড়ে উঠছে না। পরিপূর্ণ শিক্ষালাভের জন্য শ্রেণীর পাঠ্যবই যথেষ্ট নয়। পাঠ্যবই

শুধু পরীক্ষা পাসের সনদ দেয়, জীবনের জন্য অপরিহার্য পরিপূর্ণ শিক্ষা দেয় না। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে গ্রন্থাগার বিদ্যালয়ের হৃদপিন্ড স্বরূপ। আসলে গ্রন্থাগার শুধু বিদ্যালয়ের নয়, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের হৃদপিণ্ডস্বরূপ। হৃদপিন্ড ছাড়া যেমন দেহ অসার, তেমনি গ্রন্থাগার ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও অসার। সুতরাং পরিপূর্ণ ও যুগোপযোগী শিক্ষার জন্য আমাদের দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার অপরিহার্য। কারণ, গ্রন্থাগার জ্ঞান সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্যেই, যা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের সাথে এক ও অভিন্ন।

শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়ার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের একটি মূল কেন্দ্র হলো গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারটি সুগঠিত করতে না পারলে শিক্ষার্থীরা মানব সভ্যতার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে না। গ্রন্থাগারে জ্ঞানের প্রবাহ সঞ্চিত হয়ে আছে। এই প্রবাহকে চলমান করতে প্রয়োজন পাঠকের, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের সঞ্চিত জ্ঞানের প্রবাহকে চলমান করতে ভূমিকা রাখে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা। সুতরাং শিক্ষায় গ্রন্থাগার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কোন কোন শিক্ষাবিদ গ্রন্থাগারকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই অন্য একটি সংস্করণ বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে একটি গ্রন্থাগারও তাই করতে পারে।

শিক্ষা ও গ্রন্থাগার মূলত একই গন্তব্যের অভিযাত্রী যার উদ্দেশ্য হলো- মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রীয় জীবনের গুণগত পরিবর্তন সাধন এবং প্রগতির দিকে ধাবিত করা। শিক্ষার মূল উৎস জ্ঞান সামগ্রী এবং সেগুলোর প্রাণকেন্দ্র হলো গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার শিক্ষা উপকরণ যোগানে ও শিক্ষা বিকাশে সহায়ক। শিক্ষা ও গ্রন্থাগার সকল সভ্যতা, কৃষ্টির বাহন ও বিকাশে সহায়ক। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই লক্ষ করা যায় জ্ঞান ভান্ডার হিসেবে বিবেচিত গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করা হয়েছে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, সমাজ উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। বস্তুত জ্ঞানের আলোক বর্তিকায় যেমন সভ্যতার গোড়াপত্তন, বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন হয়েছে, তেমনি শিক্ষায়/জ্ঞান সামগ্রী বিতরণে/লালনে/সংরক্ষণে গ্রন্থাগার অনাদিকাল থেকে বটবৃক্ষের মতো, নিঃস্বার্থ দায়িত্ব পালন করে আসছে।

শিক্ষায় অন্তর্নিহিত সুফল প্রাপ্তির জন্য মানসম্পন্ন যুগোপযোগী, পরিপূর্ণ, বাস্তবতা সমৃদ্ধ ও সুষম শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান জরুরী। তা সম্ভব হয় যদি সে শিক্ষা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট সম্পন্ন হয়। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটই শিক্ষাকে পরিপূর্ণ, সার্বজনীন ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। অন্যথায় শিক্ষার গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োগ ক্ষেত্র সীমিত হয়ে পড়ে। আর এজন্যই শিক্ষাক্রমের বাইরেও অনেক কিছু জানার থাকে, শেখার থাকে, নিজেকে গড়ে তোলার অনেক সুযোগ থাকে। তা সম্ভব হয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যমে। শিক্ষাক্রমে যে বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পাঠদান করা হয় তার পরিপূর্ণতা, পরিপুষ্টতা ও সুষম আত্মস্থ করার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহার অপরিহার্য। গ্রন্থাগার নিম্নলিখিতভাবে শিক্ষার কাজে সহযোগিতা করে :

ক) শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে সহায়তা করে : গ্রন্থাগারে প্রত্যেক শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত পাঠের সুযোগ পায়। এর ফলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজস্ব ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষা অর্জন করতে পারে।

শিক্ষার্থী যেহেতু নিজের চাহিদা, রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে, সেহেতু শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে শিখনে বা স্ব-শিখনে উৎসাহিত হয়।

খ) শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তৃতি ঘটায়: গ্রন্থাগারে বিভিন্ন লেখকের, বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের, বিভিন্ন বিষয়ের, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের লেখা বই থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ধরণের এইসব বই পড়ে একজন পাঠক বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করে।

গ) শিক্ষার্থীর পাঠাভ্যাস গঠনে সহায়তা করে: গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থীর রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থ সংগ্রহ করা হলে শিক্ষার্থীরা এসব বই পড়তে শুরু করে। ফলে নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের মধ্যে সুষ্ঠু পাঠাভ্যাস গড়ে উঠতে পারে।

ঘ) শিক্ষকের প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা করে: শ্রেণিকক্ষে উত্তম পাঠদানের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষকের উত্তম প্রস্তুতি। গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষকগণ স্ব-স্ব বিষয়ে উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেন।

ঙ) শিক্ষামূলক প্রদীপনের/উপকরণের সাথে পরিচিত করে : গ্রন্থাগার শুধু গ্রন্থসম্ভারে পরিপূর্ণ থাকে না। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষামূলক প্রদীপন যেমন– মানচিত্র, গ্লোব, এ্যাটলাস, চার্ট ইত্যাদিও সংরক্ষিত থাকে। গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এসবের সাথে পরিচিত হয় এবং এদের ব্যবহার শিক্ষার মাধ্যমে তাদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে পারে।

চ) প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা স্থাপনে সহায়তা করে : শ্রেণিকক্ষে কোন শিক্ষকের অনুপস্থিতির কারণে উক্ত শ্রেণির শিক্ষার্থীরা হৈ চৈ সৃষ্টি করতে পারে। এমতাবস্থায় ঐ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রতি উৎসাহিত করা হলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের মাঝে একটা শৃঙ্খলাবোধ জন্মে, তেমনি প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শ্রেণির স্বাভাবিক কাজকর্মে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে না।

ছ) সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটায়: গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিভিন্ন সংস্কৃতির গ্রন্থরাজি, চলচ্চিত্র, স্থিরচিত্র ইত্যাদি ব্যবহার ও দর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে অন্য সংস্কৃতির একটি তুলনামূলক চিত্র নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে, ফলে শিক্ষার্থীর মাঝে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।

পরিশেষে বলা যায়, গ্রন্থাগার এ সকল শিক্ষামূলক কাজের দ্বারা শিক্ষার্থী যে কোন রকম শিক্ষা অর্জনের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা:

গ্রন্থাগার হলো জ্ঞান ভান্ডার এবং এটি শিক্ষা ব্যবস্থার হৃদপিন্ড স্বরূপ।

পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শৈশবে শিক্ষার্থীদের হাতে মনোরম বই তুলে দেয়া, বিভিন্ন বইয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ, বইয়ের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগানো সর্বোপরি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠাভ্যাসের বীজ বপনের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের উপযোগিতা অনুধাবন, গ্রন্থাগার সম্পদ উন্নয়ন, সংগঠন-সর্বোপরি ছাত্র শিক্ষক সকলের জন্য যুগোপযোগী ও মানসম্মত তথ্য, সেবা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহার ও পরিচালনা কলাকৌশল সম্পর্কে

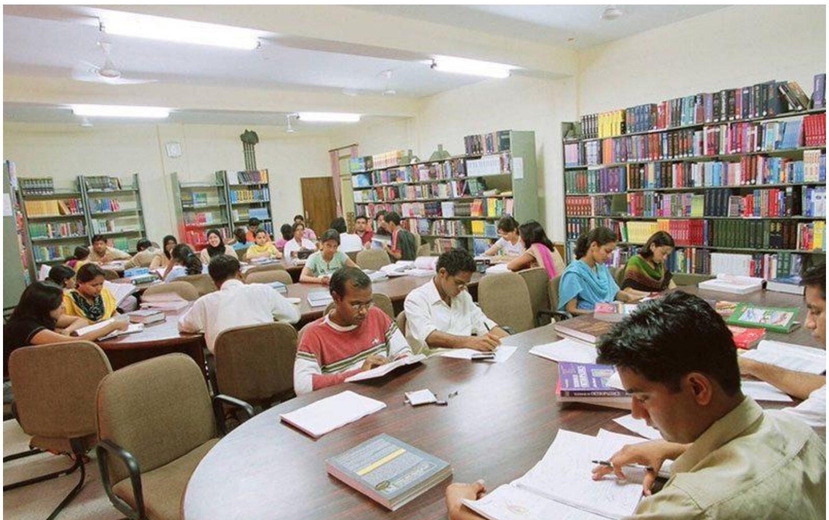

শিক্ষক গ্রন্থাগারিক এর বাস্তব ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারমুখী করার প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের দায়িত্ব অপরিসীম। তথ্যের বিভিন্ন উৎস ও এদের ব্যবহার সম্পর্কিত ধারণা শিক্ষকের অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করে, যা শিখন প্রক্রিয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান সমুদ্রে বিচরণ ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করবে এবং সহায়ক উপকরণ হিসেবে কাজ করবে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলো সবচেয়ে অবহেলিত। অথচ প্রাথমিক পর্যায় থেকেই শিশুদের মাঝে পাঠাভ্যাস সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা একটি জাতীয় দায়িত্ব। তাছাড়া প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বিকাশ এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তৃতি ঘটানো অপরিহার্য। কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই আমাদের শিশুদের পরিপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত। তাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষকগণ নিজেদের মাঝে পাঠাভ্যাস গড়ে তুলে শিক্ষার্থীদের মাঝেও সঞ্চারিত করতে পারেন।

শিশুরা হচ্ছে আগামী দিনের দেশ গড়ার কারিগর। তাদের মধ্যে লুকায়িত আছে প্রচুর সম্ভাবনা। আমরা একমাত্র নতুনদের কাছেই আশা করতে পারি ভবিষ্যৎ দেশ গড়ার দায়িত্ব গ্রহণের। তাই এই সম্ভাবনাময় কোমলমতি শিশুদের শিশুকাল থেকেই অত্যন্ত যত্নসহকারে গড়ে তুলতে হবে, করতে হবে প্রচুর সম্ভাবনাময় মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ। এই পরিপূর্ণ বিকাশ কখনোই সম্ভব হবে না যদি না এই শিশুরা গ্রন্থাগার ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

একটি শিশু যখন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই গ্রন্থাগার ব্যবহারে অভ্যস্ত হবে তখন সে বুঝতে পারবে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান অন্বেষণ করা, শুধু পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করে পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়াই নয়। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যখন একটি শিশু আলাদা আঙ্গিকে একটি বই পড়বে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে একটি প্রশ্ন আসবে- এই বইটি আমি কেন পড়ব? কেন প্রশ্নের জবাব সে একটাই পাবে, তা হচ্ছে জ্ঞান অন্বেষণের জন্য পড়ব- নতুনকে জানার জন্য পড়ব। এখানেই তার কাছে ধারণা জন্মাবে যে পড়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান অন্বেষণ করা, নতুনকে জানা ও নতুনকে আবিষ্কার করা। আর একটি শিশুর যখন শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই এই ধারণা জন্মাবে, এই ধারণা আস্তে আস্তে বদ্ধমূল হবে। তখন সে বিভিন্নমুখী জ্ঞান অর্জনের প্রতি অনুরাগী হবে। এই প্রকৃত ও সত্য ধারণালব্ধ শিশুটি দেশের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। এটিই হবে আমাদের দেশের জন্য সবচেয়ে বড় পাওয়া। আর এই বড় পাওয়াকে অর্জন করতে হলে আমাদের বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি শিশু যেন হাসতে হাসতে খেলার ছলে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। সেই ধরনের একটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান সময়ের চাহিদা আর এই চাহিদাটি আজ থেকে বহুদিন আগেই অনুধাবন করতে পেরেছে- ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডে মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন রেগুলেশন অব ১৯৪৪ নির্দেশ দেয় যে, সেখানে প্রতিটি নবনির্মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আবশ্যিকভাবে একটি লাইব্রেরি ভবন থাকবে। আমাদের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে উন্নত দেশগুলোর চিন্তা চেতনার কত পার্থক্য তা আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি। তবে আশার কথা, দেরিতে হলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

গ্রন্থাগার কী?

গ্রন্থাগার হলো সেই স্থান যেখানে সমাজের সকলের জন্য বই বা জ্ঞান সমৃদ্ধ অন্যান্য সামগ্রী সংগৃহীত ও পদ্ধতিগতভাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যে কেউ তা ব্যবহার করতে পারে। এটি জ্ঞানচর্চার একটি উৎকৃষ্ট স্থান। এখানে মানুষের তথ্যসেবা ও জ্ঞানার্জনের জন্য জ্ঞানসমৃদ্ধ বই ও অন্যান্য সামগ্রী পরিকল্পিত ও সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা হয়। তথ্যানুসন্ধানী ও জ্ঞানপিপাসু মানুষ তাদের কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান এখান থেকে খুব অল্প সময়ে পেতে পারেন। গ্রন্থাগার জাতির শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানের সকল শাখার ধারক ও বাহক।

মানুষের সৃষ্ট জ্ঞান, মনের ভাব, মুখের ভাষা, হাতের অংকন যে কোনভাবেই প্রকাশিত হোক না কেন গ্রন্থাগারই একমাত্র স্থান যেখানে এগুলোকে ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য ধরে রাখা হয়।

যুগ পাল্টাচ্ছে, পাল্টাচ্ছে মানুষের ধ্যান-ধারণা ও রুচিবোধ। বিকাশ ঘটছে জ্ঞান ও গুণের। এভাবেই নতুনের আগমন আমাদের মাঝে, যা নিয়ে আজ গর্ব করি। গ্রন্থাগারই এসবের উত্তম সংরক্ষণাগার, যেখানে সমাজের বিভিন্ন মত ও পথের মানুষের বহুমুখী চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে। জ্ঞানের বহুমুখী চাহিদা পূরণের এই যে প্রয়োজনীয়তা তা থেকেই বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থাগারের উৎপত্তি।

গ্রন্থাগার কেন?

গ্রন্থাগার জাতির সঠিক ইতিহাস জানতে, মেধা বিকাশে এবং বুদ্ধিগত পরিপক্বতা অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং এর ব্যবহারে জ্ঞানের বহুমুখী চাহিদা পূরণ হয়। যেমন- তথ্য সংগ্রহে, সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে, আত্মবিশ্বাস অর্জনে, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানার্জনের মাত্রা বৃদ্ধি করণে, পাঠাভ্যাস সৃষ্টি করণে, গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনা করতে, শিখন-শেখানো উপকরণ প্রস্তুতিতে, নৈতিক, মানসিক, সামাজিক, ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করণে, যোগাযোগ স্থাপনে ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা অর্জনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন।

লাইব্রেরির প্রকারভেদঃ

সমাজে চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে। লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ব্যবহারকারীর ধরন এবং উপাদানের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে লাইব্রেরিকে সাধারণত ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার (Personal Library)

২. গণ গ্রন্থাগার (Public Libirary)

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার (Academic Library)

৪. বিশেষ গ্রন্থাগার (Special Library)

৫. জাতীয় গ্রন্থাগার (National Library)

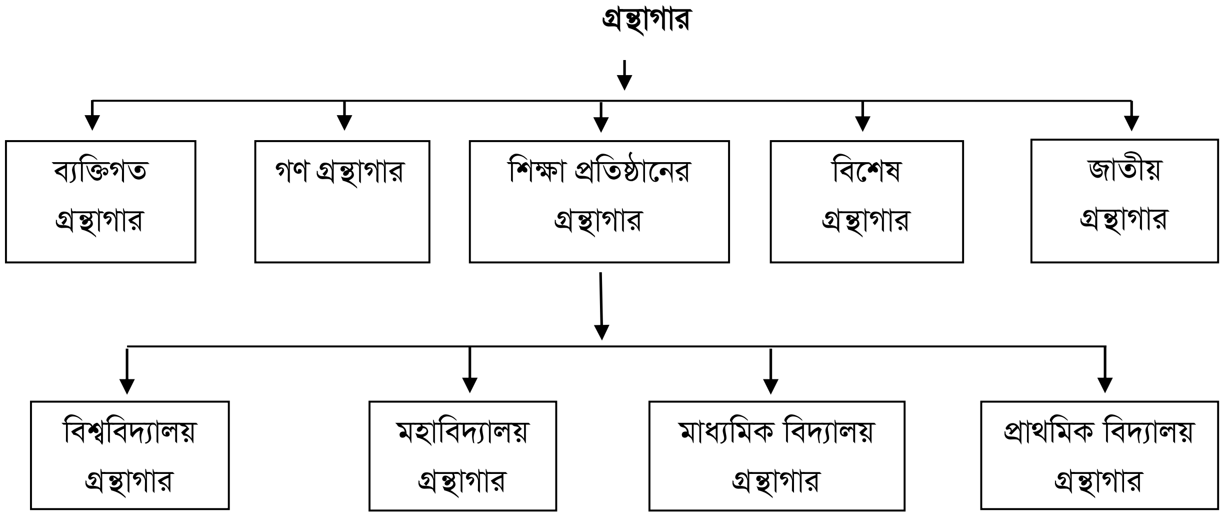

১. ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার:

ব্যক্তির নিজস্ব উদ্যোগে পরিবারের জন্য যে লাইব্রেরি গড়ে তোলে তাকে ব্যক্তিগত লাইব্রেরি বলে। প্রাচীনকালে বিত্তশালী লোকেরা তাদের পরিবারের সদস্যদের জ্ঞানচর্চার জন্য এ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসে দেখা যায়, ব্যক্তিগত লাইব্রেরি দিয়ে লাইব্রেরির প্রম যাত্রা শুরু হয়। বর্তমান সমাজে শিক্ষিত ও মননশীল ব্যক্তিদের পরিবারে এ ধরনের লাইব্রেরি গড়ে উঠতে দেখা যায়। পরিবারের সদস্যগণ এ লাইব্রেরি ব্যবহারকারী।

কার্যাবলি :

- পরিবারের সদস্যদের পাঠ চাহিদা পূরণ করে।
- সদস্যদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলে।
- পরিবারের তথ্য কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
- পারিবারিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে।

২। গণ-গ্রন্থাগার :

কোন অঞ্চলে বা দেশের সকল স্তরের মানুষের পাঠ চাহিদা পূরণের জন্য যে লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয় তাকে গণ-গ্রন্থাগার বলা হয়। এর লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র জাতিকে পরিকল্পিত উপায়ে লাইব্রেরি সেবার মাধ্যমে মেধা বিকাশে সাহায্য করা। সকল স্তরের জনগণ এ লাইব্রেরির ব্যবহারকারী।

কার্যাবলি :

- সকল স্তরের মানুষের পাঠ চাহিদা পূরণ করে।
- জনগণের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলে।
- বই প্রদর্শনীর আয়োজন করে।
- সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
- সরকারকে তথ্যসেবা প্রদান করে।
- ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির মাধ্যমে সেবা প্রদান করে।

কেন্দ্রীয় গণ গ্রন্থাগার

৩। <u>শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার:</u>

শিক্ষাস্তরের অন্তর্ভুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যসূচি সংশ্লিষ্ট বই পুস্তকের সংগ্রহ নিয়ে এ গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ, নৈতিকতা, চরিত্র গঠন, সামাজিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিকাশমূলক বইও এ গ্রন্থাগার এ সংগ্রহ করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এ গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এর ব্যবহারকারী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন:

- বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
- মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার
- মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার
- প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

<u>কার্যাবলি :</u>

- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পাঠ চাহিদা পূরণ করে।
- শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলে।
- গবেষণার কাজকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে।
- শিক্ষকের পাঠদান কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

৪। <u>বিশেষ গ্রন্থাগার:</u>

কোন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি অফিস বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রবিষয়ক বই পুস্তক ও তথ্য নিয়ে এ ধরনের লাইব্রেরি গড়ে উঠে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারি, বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণ এ লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকেন।

কার্যাবলি :

- নিজস্ব ক্ষেত্রবিষয়ক ডকুমেন্ট, ডাটা, তথ্য সংগ্রহ করে।
- তথ্যকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
- গবেষণার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করে।
- তথ্যের সার-সংক্ষেপ তৈরি করে সরবরাহ করে।
- বইয়ের চেয়ে Non-Book গুলো বেশি সংগ্রহ করে।

৫। জাতীয় গ্রন্থাগার:

একটি দেশের অভ্যন্তরে প্রকাশিত সকল পুস্তক, সাময়িকী, ক্ষুদ্র পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা, দলিল-দস্তাবেজ, নথিপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করে যে লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয় তাকে জাতীয় লাইব্রেরি বলা হয়। জাতীয় লাইব্রেরি দেশে এক বা একাধিক থাকতে পারে। ঢাকায় শেরে বাংলানগর আগারগাঁওতে বাংলাদেশ জাতীয় লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কার্যাবলীঃ

- দেশে প্রকাশিত সকল বই, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি সংগ্রহ করে।
- সরকারের তথ্য পরিবেশন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
- জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন ও প্রকাশ করে থাকে।
- বই প্রদর্শনী করে থাকে।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিময় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

National Library Building

সমস্যা :

- লাইব্রেরির প্রকারভেদে নিম্নে উল্লিখিত লাইব্রেরিগুলোর শ্রেণিবিভাগ করুন।
- পলিটেকনিক্যাল লাইব্রেরি।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি।
- লাইব্রেরি অব কংগ্রেস।
- ডা. জাহাঙ্গীরের লাইব্রেরি।

- উডবার্ণ পাবলিক লাইব্রেরি।
- আন্তআণবিক শক্তি কমিশন লাইব্রেরি।
- মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি।
- জাপান ডায়েট লাইব্রেরি।
- জেলা পাবলিক লাইব্রেরি।
- সক্রেটিসের লাইব্রেরি।
- পিটিআই লাইব্রেরি।

লাইব্রেরি ভবন/কক্ষ নির্বাচন :

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয় কাঠামোতে লাইব্রেরি কার্যক্রমের কোন ভবন/কক্ষ নেই, কিন্তু শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস ও জ্ঞানচর্চার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয় অবকাঠামোতে একটি পরিকল্পিত লাইব্রেরি কক্ষ অত্যাবশ্যক। বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি কক্ষ নির্বাচনে নিম্নের উল্লিখিত দিকগুলো নজর রাখা প্রয়োজন।

- কক্ষটি এমন স্থানে নির্বাচন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সহজেই ব্যবহার করতে পারেন।
- কক্ষটির একটি মাত্র প্রবেশ ও নির্গমন পথ থাকবে যাতে নিরাপত্তা বিধান করা যায়।
- কক্ষটি এমন হওয়া উচিত যাতে সূর্যালোক, বৃষ্টির পানি, আর্দ্র আবহাওয়া ইত্যাদি ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।
- কক্ষটিতে যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস ও কাজ উপযোগী পরিবেশ থাকে সে ব্যবস্থা করে রাখতে হবে।
- বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি যেন সহজলভ্য হয়।
- কক্ষটি যাতে ভবিষ্যতে সম্প্রসারিত করা যায় এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

লাইব্রেরি সামগ্রী :

- আসবাবপত্রঃ রিডিং টেবিল, চেয়ার, বুক শেলফ, ক্যাটালগ ক্যাবিনেট, ফাইল ক্যাবিনেট, ডিস-প্লে বোর্ড, বুক ট্রে, পেপার স্ট্যান্ড ইত্যাদি।
- **পঠনসামগ্রীঃ** বই, মড্যুল, পাঠ্য বই, সাময়িকী, পত্র-পত্রিকা, ম্যানুয়েল ইত্যাদি।
- **উপকরণ সামগ্রী :** ক্যাটালগ কার্ড, বুকস্লিপ, বুক কার্ড, বুক পকেট, অ্যাকসেশন রেজিস্টার, সদস্য কার্ড, ইস্যু রেজিস্টার ইত্যাদি।
- **অডিও ভিজ্যুয়াল সামগ্রী :** মাইক্রেফিল্ম রিডার, মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিস, মাইক্রোকার্ড রিডার, টেপ-রেকর্ডার, ভিডিও, ডিস্ক, টেপ, ফটোকপিয়ার, কম্পিউটার ইত্যাদি।
- **রেফারেন্স সামগ্রী :** ডায়েরি, অভিধান, বিশ্বকোষ, অ্যালম্যানাক, ডাইরেকটরি, গেজেটিয়ার, ভ্রমণ গাইড, জীবনী কোষ, ম্যাপ, চার্ট, অ্যাটলাস, গ্লোব, বর্ষপঞ্জি, হ্যান্ড বুক, সিরিয়াল ইত্যাদি।

<u>বই নির্বাচন :</u>

যে কোন গ্রন্থাগারই একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ হলো পাঠকদের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী তথ্যসেবা প্রদান করা, তথ্যজ্ঞান বিতরণ করা। সঠিক উপকরণ সংগ্রহ করতে না পারলে পাঠকের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। তাই গ্রন্থাগারের জন্য সঠিক সংগ্রহ গড়ে তোলা বা নির্বাচন করা খুবই প্রয়োজন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে প্রতি বছর দেশে ও বিদেশে অসংখ্য বই প্রকাশিত হচ্ছে। একটি গ্রন্থাগারের ধারণ ক্ষমতা এবং আর্থিক সচ্ছলতা যতই থাকুক না কেন তার ক্ষেত্রে সকল প্রকাশনা গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। গ্রন্থাগারের আয়তন, আর্থিক সামর্থ্য এবং প্রকৃতি অনুযায়ী গ্রন্থ নির্বাচন একটি অপরিহার্য বিষয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য গ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা আরো ব্যাপক। বয়স্ক পাঠকদের জন্য গ্রন্থ আর শিশু-কিশোরদের গ্রন্থ কখনোই এক হতে পারে না। প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অবশ্যই শিশু-কিশোরদের পড়ার উপযোগী গ্রন্থ সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিনিয়ত প্রকাশিত সকল গ্রন্থেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করা সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। সুতরাং শিশু-কিশোরদের বহুমুখী জ্ঞান বিকাশে সহায়ক, চরিত্র ও নৈতিকতা গঠনমূলক গ্রন্থ, তাদের মৌলিকত্ব বিকাশে সহায়তাকারী গ্রন্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করা উচিত। উপরোক্ত বিষয়গুলোর সঠিক বাস্তবায়নের জন্যই গ্রন্থাগারের গ্রন্থ নির্বাচনের বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ।

একটি গ্রন্থাগারের সঠিক সংগ্রহ গড়ে তুলতে হলে সঠিক ও পাঠকদের জন্য উপযোগী গ্রন্থ নির্বাচন করতে হয়। গ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নির্বাচনী নীতিমালা অনুসরণ করা গ্রন্থাগারিকের অবশ্যই কর্তব্য। গ্রন্থ নির্বাচনের একটি সাধারণ নীতিমালা তুলে ধরা হলো:

১। *বইটির লেখক বিখ্যাত কিনা লক্ষ রাখতে হবে :* একই বিষয়বস্তুর উপর একাধিক লেখকের বই বাজারে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে অধিক খ্যাতিসম্পন্ন, অধিক শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন লেখকের বইটি গ্রন্থাগারের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

২। *বইটির প্রকাশক বিখ্যাত কিনা দেখতে হবে :* প্রকাশকের খ্যাতি, প্রকাশনার অভিজ্ঞতা একটি মানসম্মত বই প্রকাশে সহায়তা করে। গ্রন্থাগারের জন্য বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিখ্যাত প্রকাশকের বইটি নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়।

৩। *বইয়ের বিষয়বস্তু মূল্যায়ন করতে হবে :* প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য বই নির্বাচন করার ক্ষেত্রে এর বিষয়বস্তু মূল্যায়ন অপরিহার্য। প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাঠক যেহেতু শিশু-কিশোর, সেহেতু লক্ষ রাখতে হবে বইটিতে নৈতিকতা বিরোধী কোন বক্তব্য আছে কিনা অথবা এর বিষয়বস্তু শিশুদের পড়ার উপযোগী কিনা। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে এমন কোন বক্তব্য আছে কি না।

৪। *শিশু-কিশোরদের উপযোগী বই নির্বাচন করেত হবে :* একই বিষয়বস্তু বা ঘটনার উপর দুই ধরনের সংকলন থাকতে পারে, যেমন শিশু-কিশোরদের জন্য সংকলন এবং বয়স্কদের জন্য সংকলন। এক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য শিশু-কিশোর সংকলনটি নির্বাচন করতে হবে। যেমন- ছোটদের বিশ্বনবী, ছোটদের আরব্য উপন্যাস ইত্যাদি।

৫। *বইয়ের বাঁধাই, ছাপা, অঙ্গ সৌষ্ঠব এবং সন্নিবেশিত ছবি শিশু-কিশোরদের উপযোগী কিনা :* শিশু কিশোরের জন্য বইয়ের বাঁধাই মজবুত হতে হবে। তুলনামূলকভাবে বড় অক্ষরে স্পষ্ট ছাপা হতে হবে, বাহ্যিক সৌন্দর্য শিশু-কিশোরদের আকর্ষণ করার মত হতে হবে এবং বইয়ে সন্নিবেশিত ছবি রঙিন বা স্পষ্ট হতে হবে, যা শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করতে পারে। উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে বই নির্বাচন করতে হবে।

৬। *বইয়ের পাতা ছেঁড়া বা ছাপায় অসংগতি আছে কিনা :* প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য বই নির্বাচন করার সময় লক্ষ রাখতে হবে বইটির পাতা ছেঁড়া কিনা বা পৃষ্ঠা সংযোজনে অসংগতি আছে কিনা ইত্যাদি। এসকল বিষয় লক্ষ রেখে সতর্কতার সাথে গ্রন্থ নির্বাচন করতে হবে।

বই নির্বাচন যে কোন লাইব্রেরির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বইয়ের জগৎ সম্পর্কে লাইব্রেরিয়ানকে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হয়। লাইব্রেরিতে পাঠসামগ্রী নির্বাচন করার সময় লাইব্রেরির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কোন ধরনের ব্যবহারকারী লাইব্রেরি ব্যবহার করবেন তাদের চাহিদা বিবেচনা করে পাঠসামগ্রী নির্বাচন করতে হবে। একাডেমিক লাইব্রেরির ক্ষেত্রে শিক্ষকের ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী কারিকুলাম সংশ্লিষ্ট বই পুস্তক নির্বাচনে বেশি গুরুত্ব দিতে হয়। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ের বইও নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন ধরনের বই নির্বাচনের জন্য Book Selection Aids- এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বই নির্বাচনের পর বইয়ের তালিকা প্রণয়ন করতে হয়।

বই সংগ্রহ :

গ্রন্থাগার হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠসামগ্রী সহজে পাওয়ার একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। অবাধে পড়াশোনা ও আলোচনার জন্য গ্রন্থাগারের সেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত। পাঠক তার কাঙ্ক্ষিত তথ্যটির জন্য গ্রন্থাগারে যাতায়াত করে থাকেন। সুতরাং সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যটি পাঠকের হাতে পৌঁছানো, গ্রন্থাগার সেবার একটি মৌলিক বিষয়। এজন্য গ্রন্থাগারের পাঠকের বিভিন্নমুখী চাহিদা মেটানোর জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ গড়ে তুলতে হবে এবং পাঠকের সহজ প্রাপ্তির জন্য বিন্যাস করে রাখতে হবে। একটি গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের সফল বাস্তবায়ন ঘটে, গ্রন্থাগারটি শিক্ষা ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে কতটা ভূমিকা পালন করছে

তার উপর। এজন্য গ্রন্থাগারের সংগ্রহ গড়ে তোলার উপর গুরুত্বআরোপ করতে হয়। গ্রন্থাগার সংগ্রহ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যেন সমগ্র সংগ্রহ বর্তমান ও ভবিষ্যতের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করে। পাঠকের যে কোন চাহিদা পূরণের জন্য সংগ্রহ গড়ে তোলা অনস্বীকার্য।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় করার জন্য এবং তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গ্রন্থাগারের সংগ্রহ (বই, ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকা, ম্যাপ, চার্ট, আকর্ষণীয় ছবি ইত্যাদি) গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের মূল্যবোধ সৃষ্টি, নৈতিকতা গঠন, চরিত্র গঠন, সামাজিক এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে এমন সব সংগ্রহ গ্রন্থাগারে সংযোজন করতে হবে। গ্রন্থাগার সংগ্রহ গড়ে তোলার জন্য কিছু বিষয়ের উপর লক্ষ রাখতে হবে।

১। ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী সংগ্রহ গড়ে তোলা : প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংগ্রহ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী সংগ্রহ গড়ে তুলতে হবে অর্থাৎ শিশু-কিশোর পাঠকরা কোন ধরনের বই পড়তে আগ্রহী, তাদের চাহিদা কী এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

২। পাঠ্য বিষয়ের উপর সংগ্রহ গড়ে তোলা : আমাদের দেশের দরিদ্র অভিভাবকগণ অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক সংকটের কারণে সময়মতো সন্তানদের পাঠ্যপুস্তক কিনে দিতে পারেন না। এ ধরনের অসমর্থ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন শ্রেণির উপযোগী পাঠ্য বই ও সংশ্লিষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে।

৩। শিশুদের চরিত্র ও নৈতিকতা গঠনমূলক বই সংগ্রহ করা : একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হলো দেশের চরিত্রবান ও নৈতিকতা সম্পন্ন নাগরিকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। দেশের জন্য, সমাজের জন্য, চরিত্রবান ও নৈতিকতা সম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলার প্রাথমিক পর্যায় হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়। এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের চরিত্র গঠনমূলক ও নৈতিকতা বিকাশমূলক গ্রন্থ সংগ্রহ করতে হবে। যেমন–বিখ্যাত ও আদর্শবান মনীষীদের জীবনী, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন বিষয়ক গ্রন্থ ইত্যাদি।

৪। সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বিকাশমূলক গ্রন্থ : নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে সমুন্নত রাখা দেশের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। দেশের প্রতিটি নাগরিককে এ বিষয়ে সচেতন করতে হলে শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে হবে। এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সম্পর্কিত গ্রন্থ সংগ্রহের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বিকাশে সহায়তা করতে হবে।

নির্বাচিত বইয়ের তালিকা সম্পন্ন করার পর ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করতে হবে। নির্ভরযোগ্য দরদাতাকে বই সরবরাহের জন্য মনোনীত করে বই সরবরাহের জন্য আদেশ দেয়া হয়। সরবরাহকারীর নিকট থেকে বই গ্রহণের পর প্রতিটি বই ইনভয়েসের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। মেলানোর পর কোন প্রকার অসংগতি না থাকলে বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়।

সংযোজনী, মজুত যাচাই ও শ্রেণিকরণ

অ্যাকসেশনিং (সংযোজনী)

গ্রন্থাগার একটি বিন্যস্ত ও পদ্ধতিগত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থ সংরক্ষণাগার। নিয়মনীতি অনুসারে গ্রন্থাগার পরিচালিত হয় গ্রন্থাগার একটি আদর্শ সেবা প্রতিষ্ঠান। সর্বদা পাঠকের সেবায় নিয়োজিত গ্রন্থাগারের মৌলিক উদ্দেশ্যই হচ্ছে সেবাদান। এজন্যই অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয় প্রতিটি কাজে ও কর্মে। তাই গ্রন্থাগার একটি সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংযোজন, কারিগরি পদ্ধতির প্রথম ধাপ, যা গ্রন্থাগারে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সংযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি গ্রন্থাগার সংগ্রহ কতটা সমৃদ্ধ তা অনুমান করা যায়।

গ্রন্থাগারে যে রেজিস্টারে পুস্তক সময়ানুক্রমিক ভাবে (Chronological Order) এন্ট্রি করা হয় তাকে সংযোজনী রেজিস্টার বলা হয়। সংযোজনী রেজিস্টারে প্রতিটি বইয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট নম্বর দেয়া হয়। যে ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে রেজিস্টারে পুস্তকটি এন্ট্রি করা হয় সে নম্বরটিকেই সংযোজনী নম্বর বলা হয়।

গ্রন্থাগারে সংযোজন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গ্রন্থাগারে যে কোন পাঠ উপকরণ নির্বাচন ও ক্রয়ের পরে গ্রন্থাগারের সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। কিন্তু গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার সামগ্রীর অন্তর্ভুক্তি করণের পূর্বে এমন কতগুলো কাজ করতে হয় যা নিম্নে দেখানো হলো।

১। নির্বাচিত ও ক্রয়নির্দেশ অনুযায়ী উপকরণ সরবরাহকারী সরবরাহ করেছেন কিনা তা যাচাই করা।

২। বিল অনুযায়ী উপকরণ তালিকা যাচাই করা।

৩। অনুমোদিত তালিকা ও বিলে উল্লিখিত মূল্য যাচাই করা।

৪। উপকরণের মানগত বৈশিষ্ট্যগুলো যাচাই করা।

৫। মুদ্রণ, কাগজ ও বাঁধাই এর গুণগতমান যাচাই করা।

৬। সংযোজনের পূর্বেই সরবরাহকারীর কাছে যে কোন রকমের সরবরাহ সংশ্লিষ্ট দাবি উপস্থাপন করা যায়।

৭। সরবরাহ নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।

ক) প্রথমেই সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের সিলমোহর দিতে হবে।

খ) সংশ্লিষ্ট উপকরণটিতে সংযোজন সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

গ) সরকারি বিল অনুযায়ী মূল্য উল্লেখসহ অন্যান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সরবরাহকারীর সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে কি না মন্তব্য করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে বিল পরিশোধের জন্য।

৮। সরবরাহ চূড়ান্ত ও নিশ্চিত বুঝে নিম্নের ছক অনুযায়ী সংযোজন কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। একটি সংযোজন রেজিস্টারে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে তা ছক আকারে দেখানো হলো।

সংযোজন তারিখ	সংযোজন সংখ্যা	লেখক	শিরোনাম	প্রকাশনা স্থান	প্রকাশক	প্রকাশনা সন	উৎস/ সরবরাহকারী	বিল নং ও তারিখ	সংস্করণ	পৃষ্ঠা	মূল্য	ক্লু বা গোপনীয় পৃষ্ঠা	ডাক সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	০০১													
	০০২													
	০০৩													

সংযোজন রেজিস্টার ব্যবহার বিধি :

১। *সংযোজন তারিখ :* এখানে প্রথমে যে তারিখে বই সংযোজন করা হয় সেই তারিখ লেখতে হয় এবং এই তারিখই আবার শিরোনাম পৃষ্ঠার অপর পাতায় যেখানে সংযোজন সংখ্যা লেখা হয় তার নিচে লিখতে হয়।

২। *সংযোজন সংখ্যা :* এখানে যে বইটি সংযোজন করা হবে সে বইটির জন্য একটি সংখ্যা বরাদ্দ করা হয়। অর্থাৎ একটি বইয়ের একটি সংখ্যা। পর পর যে বইটি রেজিস্টারে এন্ট্রি করা হবে সে অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে সংযোজন সংখ্যা বসবে। এটা সব সময় শিরোনাম পাতার উল্টা পৃষ্ঠায় লেখতে হয়।

৩। *লেখক :* এখানে বইটির যে অথোরিটি বা কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক ইত্যাদি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে হয়।

৪। *শিরোনাম :* শিরোনাম পৃষ্ঠা দেখে তবেই পুরো শিরোনাম লিখতে হবে। কোন কোন বইয়ে বিকল্প শিরোনামও থাকতে দেখা যায়। বিকল্প শিরোনামও লিখতে হবে।

৫। *প্রকাশনার স্থান :* বইটি যে স্থান থেকে প্রকাশিত হয়েছে সেই স্থানের নাম এই ঘরে লিখতে হবে। সাধারণত শিরোনাম পৃষ্ঠার নিচের দিকে প্রকাশকের নামের পরের পঙক্তিতে অথবা পার্শ্বে স্থানের নাম উল্লেখ থাকে।

৬। *প্রকাশক :* যিনি বইটি প্রকাশ করেছেন তিনিই প্রকাশক। এখানে প্রকাশক হিসেবে প্রকাশনা সংস্থার নাম লেখা হবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকাশনা সংস্থার সাথে জড়িত না থেকে নিজের নামে বই প্রকাশ করে থাকেন, তবে এ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির নামেই লেখা আইনসিদ্ধ।

৭। *প্রকাশনার সন :* বইটি যদি প্রথম সংস্করণের হয় তবে সন লেখায় কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। যদি প্রথম সংস্করণ ছাড়া অন্য কোন সংস্করণের (অথবা মুদ্রণের) হয় তবে সর্বশেষ মুদ্রিত তারিখটি রেজিস্টারে উল্লেখ করতে হবে। আর যদি মুদ্রণের সন উল্লেখ না থাকে তবে কপিরাইট তারিখ লিখতে হবে।

৮। *উৎস/সরবরাহকারী :* কোথা হতে বা কোন মাধ্যমে বইটি গ্রহণ করা হয়েছে তা এখানে উল্লেখ করতে হবে।

৯। *বিল নং ও তারিখ :* এখানে ক্রয়কৃত বইয়ের ক্ষেত্রে যে বিলের মাধ্যমে বই ক্রয় করা হয়েছে সে বিলটির স্মারক নং এবং বিলের উল্লিখিত তারিখ লিখতে হয়। চিঠির মাধ্যমে যদি দানকৃত বই সরবরাহ করা হয় তাহলে চিঠির স্মারক নং তারিখ লেখা যেতে পারে।

১০। *সংস্করণ :* বইটির সংস্করণ উল্লেখ করতে হয় এই ঘরে।

১১। *পৃষ্ঠা :* বইটি কত পৃষ্ঠা তা এখানে উল্লেখ করতে হয়।

১২। *মূল্য :* বইটির মূল্য বা দাম কত তা এ ঘরে উল্লেখ করতে হয়।

১৩। *ক্লু বা গোপনীয় পৃষ্ঠা :* সবার অগোচরে গ্রন্থাগারিক গ্রন্থের সংযোজন সংখ্যাটি এমন এক পৃষ্ঠায় লিখে রাখবেন যেটা গ্রন্থাগার কর্মী ছাড়া অন্য কেউ জানবে না। এর জন্য নির্ধারিত কোন পৃষ্ঠা নেই। গ্রন্থাগারিকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তবে সকল পুস্তকে একই .... নং পৃষ্ঠায় থাকতে হবে। এই সংযোজন সংখ্যা কোথায় কত পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে তা এখানে উল্লেখ করতে হবে। যদি কোন কারণে শিরোনাম পৃষ্ঠার সংযোজন সংখ্যা হারিয়ে বা ছিঁড়ে যায় তাহলে এর মাধ্যমে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

১৪। ডাক সংখ্যা : বইটির শ্রেণি নম্বর এবং লেখকের নামের দুই অক্ষর এবং শিরোনামের প্রথম অক্ষর মোট তিনটি অক্ষর একসংগে মিলে ডাক সংখ্যার সৃষ্টি হয়। যা এখানে উল্লেখ করতে হয়। যে কোন বই মজুত পরীক্ষাকালে না পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ ডাক সংখ্যা দেখে শেলফে খোঁজা যায় বইটি যথাস্থানে আছে কিনা। নতুবা ক্যাটালগ দেখা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

১৫। মন্তব্য: কোন বই হারিয়ে গেলে, নষ্ট হলে, বাতিল করা হলে অথবা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হলে এই ঘরে নোট লিখে রাখা হয়। এই ঘরের ব্যবহার বিবিধ বহুমুখী।

<u>অ্যাকসেশন রেজিস্টারের প্রয়োজনীয়তা :</u>

- লাইব্রেরিতে কত সংখ্যক বই আছে তা সহজেই জানা যায়।
- লাইব্রেরিতে মজুত হিসাব (Stock Taking) করার জন্য প্রয়োজন।
- লাইব্রেরিতে বইয়ের রেকর্ড তুলে ধরা হয়।
- পুস্তক ছাঁটাই করার জন্য এটি প্রয়োজন।
- বিবলিওগ্রাফি তৈরি করতে এর প্রয়োজন হয়।
- হারানো বইয়ের জরিমানা আদায়ের জন্য এর প্রয়োজন হয়।
- নিরীক্ষকগণ এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত বই সঠিকভাবে এন্ট্রি হয়েছে কিনা তা জানতে পারেন।
- কোন বই নষ্ট হলে কিংবা ক্ষতিসাধিত হলে এর মাধ্যমে পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে সহজে অনুধাবন করা যায় যে, সংযোজন রেজিস্টারের গুরুত্ব কতটা অধিক। সংযোজন রেজিস্টার গ্রন্থাগারের প্রাণ। এর সাহায্যে গ্রন্থাগারের ইনস্যুরেন্স করা যায় কিংবা যদি কোন কারণে প্রতিষ্ঠানটির ধ্বংস বা ক্ষয় ক্ষতি হয় তাহলে এই সংযোজনী রেজিস্টারের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব পাওয়া যায়।

<u>স্টক টেকিং বা মজুত যাচাই</u>

গ্রন্থাগারের মজুত যাচাইয়ের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতি ও পরিচালনা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো শনাক্ত করা যায় এবং পরে ত্রুটিগুলো সংশোধন করা যায়। গ্রন্থাগারের জন্য মজুত যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মজুত যাচাইয়ের ফলে একই সাথে সেলফ বিন্যাসের কাজও হয়ে যায়।

<u>মজুত যাচাই কী ও কেন?</u>

মজুত যাচাই বলতে কোন প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত সামগ্রীর অস্তিত্ব পরীক্ষা ও নিরীক্ষণকে বুঝিয়ে থাকে। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে মজুত যাচাই বলতে একটি গ্রন্থাগারের সংগৃহীত গ্রন্থ, ডকুমেন্ট, সাময়িকী ও অন্যান্য উপকরণাদির অস্তিত্বের হিসাব করা হয়। অর্থাৎ গ্রন্থাগারের জন্য সংগৃহীত উপকরণাদি ঠিকমত আছে কিনা তা মজুত যাচাইয়ের মাধ্যমে জানা যায়।

মজুত যাচাই বা স্টক টেকিং এর উদ্দেশ্যাবলি

- খায়া যাওয়া গ্রন্থগুলোকে শনাক্ত করা।
- ভুল তাকে অবস্থিত গ্রন্থগুলো শনাক্ত করা।
- বাতিলযোগ্য গ্রন্থগুলো শনাক্ত করা

<u>মজুত যাচাই বা স্টক টেকিং এর সুবিধাসমূহ ঃ</u>

- হারিয়ে যাওয়া তালিকা তৈরি করে তা সংশোধন করা যায়।
- ক্যাটালগ হালফিল করা যায়।
- হারিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ও চাহিদা আছে এমন গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করা যায়।
- হারিয়ে যাওয়ার কারণগুলো উদঘাটন করে ভবিষ্যতে ক্ষতি কমানো যায়।
- পুরানো সংস্করণ ও চাহিদাহীন গ্রন্থ প্রয়োজন অনুযায়ী বাতিল করা যায়।
- স্থানচ্যুত গ্রন্থগুলো স্থান বিন্যাস করা যায়।
- ছেঁড়া ফাটা গ্রন্থগুলো শনাক্ত করে বাঁধাইয়ের ব্যবস্থা করা যায়।

<u>মজুত যাচাই বা স্টক টেকিং এর পূর্বশর্ত ঃ</u>

যে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হলে সার্বিক পরিকল্পনা ও কিছু পূর্বশর্ত মেনে নিতে হয়। গ্রন্থাগার স্টক টেকিং বা মজুত যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। নিম্নেব পূর্বশর্তগুলো আলোচনা করা হলো।

- স্টক টেকিং এর date নির্ধারণ করতে হবে।
- এই date এর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- নির্ধারিত date জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নোটিশ দিয়ে জানাতে হবে। যাতে তারা ইস্যুকৃত বইগুলো যথাসময়ে জমা দিতে পারে।
- স্টক টেকিং এর সময় লাইব্রেরি বন্ধের ব্যবস্থা কর!ত হ!ব।
- স্টক টেকিং বা মজুত যাচাইয়ের সময় বাহিরের কোন লোক ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।

<u>মজুত যাচাই বা স্টক টেকিং পদ্ধতিঃ</u>

গ্রন্থাগারের মজুত যাচাইয়ের প্রায় ১০টি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের গ্রন্থাগারগুলোর জন্য বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য বই সংযোজন কাটা বা টিকচিহ্ন পদ্ধতি উত্তম। এই পদ্ধতিতে সংযোজন সংখ্যা ১ হতে শুরু করে মোট সংযোজন সংখ্যা ধারাবাহিক ভাবে কাগজের সিটে লেখা বা টাইপ করা হয়। সংযোজন সংখ্যাসম্বলিত সিটগুলো নিয়ে তাক থেকে বই নামিয়ে প্রাপ্ত বইয়ের সংযোজন সংখ্যার সাথে মিলিয়ে সিটের সংযোজন সংখ্যাগুলো কাটা/টিকচিহ্ন দিতে হয়। পরে যেসব সংযোজন সংখ্যায় কাটা/টিকচিহ্ন পড়েনি, সেইগুলো হারানো বা খোয়া যাওয়া বই ধরে নিতে হবে। নিম্নের নমুনা দেখানো হলো।

✓০১ ✓০২ ✓০৩ ০৪ ✓০৫ ✓০৬ ০৭ ✓০৮ ✓০৯ ✓১০

মন্তব্য : সংযোজন সংখ্যা ০৪, ০৭ বই দুটি মজুত যাচাইয়ে শেলফ বা ইস্যু রেকর্ডে পাওয়া যায় নাই।

শ্রেণিকরণ : (Classification)

জ্ঞানের পরিধি প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। নানাভাবে জ্ঞানের বর্ধিত বিষয়বস্তু নির্বাচন ও সংগঠনের মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়াই গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে পছন্দসই পথটি বেছে নেয়া বা তাকে সংগঠিত করার দায় গ্রন্থাগারিকের। গ্রন্থাগারের বই পুস্তক যদি সুসংগঠিত না থাকে তবে যথা সময়ে যথাযথ পুস্তকটি পাঠকের হাতে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয় না। গ্রন্থাগারের বইপুস্তক এমনভাবে সাজানো থাকবে যাতে পাঠক অল্প সময়েই বইটি খুঁজে পায়। গ্রন্থাগারের সেলফে বইগুলো সাজাতে হবে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকরণের মাধ্যমে।

শ্রেণিকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন বস্তু বা চিন্তাধারাসমূহকে পদের সাদৃশ্য কিংবা বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্য প্রয়োগে পৃকীকরণ কিংবা একত্রীকরণ করা হয়।

এক জাতীয় বা সমগোত্রীয় বস্তুর একত্রীকরণের শ্রেণিকরণ। বিভিন্ন ভাব বা বস্তুকে সাদৃশ্যের তারতম্য অনুযায়ী দলবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে একত্রে শ্রেণিকরণ বলে।

শ্রেণিকরণ হলো:

- একজাতীয় বা সমজাতীয় বস্তুকে একত্রীকরণ
- বিভিন্ন বস্তুকে সাদৃশ্যের তারতম্য অনুযায়ী দলবদ্ধ করা
- সাদশ্য বস্তুকে ঐক্যবদ্ধ করে আর বৈসাদৃশ্য বস্তুকে পৃথক করে
- সমজাতীয় বস্তুকে একত্রীকরণ এবং ভিন্ন জাতীয় বস্তুকে পৃথকীকরণ।
- একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বস্তুর একত্রীকরণ ও পৃথকীকরণ।

শ্রেণিকরণের প্রয়োজনীয়তা :

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রেণিকরণ ঘটে থাকে। হাটে বাজারে গেলে দেখা যায় ফলের দোকান, সবজির দোকান, মাংসের দোকান, মাছের দোকান প্রতিটি আলাদা আলাদা ঘরে সাজানো থাকে। বিদ্যালয়ে গেলে দেখা যায় বিভিন্ন শ্রেণি থাকে। গ্রন্থাগারের বইগুলো শ্রেণিবদ্ধ, স্তরে স্তরে বইয়ের সেলফে সাজানো থাকে। গ্রন্থাগারে বইয়ের জন্য শ্রেণিকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগারের বই শ্রেণিকরণ না করলে প্রয়োজনের সময় অনেক বইয়ের মাঝ থেকে কাঙ্ক্ষিত বইটি পাওয়া অনেক কষ্টকর হয়ে যায়। শ্রেণিকরণ ছাড়া মানুষের চিন্তাধারা, কর্মচেষ্টা এবং সাংগঠনিক প্রতিভার যথার্থ বিকাশ হয় না।

গ্রন্থাগারের বেশিরভাগ পুস্তকই কোন না কোন বিষয়ভিত্তিক হয়ে থাকে। পুস্তকের শ্রেণিকরণ এমন হওয়া উচিত যাতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের তিনটি মূল সূত্র পালন করা সম্ভব হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নিম্নোক্ত সূত্রগুলো S. R. Ranganathan উদ্ভাবন করেছিলেন। যেমন :

১. বই ব্যবহারের জন্য

২. প্রতিটি বইয়ের জন্য পাঠক

৩. প্রত্যেক পাঠকের জন্য বই

৪. পাঠকের সময় বাঁচাতে হবে

৫. গ্রন্থাগার একটি বর্ধিষ্ণু প্রতিষ্ঠান

এ সূত্রগুলোকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চ আইন বলা হয়। উপরোক্ত সূত্রগুলোর তথ্য অনুধাবন করে সহজে অনুমান করা যায় শ্রেণিকরণের গুরুত্ব কত অধিক। গ্রন্থাগারিক এমনভাবে পুস্তক সাজাবেন যাতে সময় নষ্ট না করে তাৎক্ষণিক পাঠকের প্রয়োজনমত সঠিক পুস্তক পাঠককে দিতে পারেন।

গ্রন্থাগারের পুস্তক যদি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী সাজানো না থাকে তাহলে নির্দিষ্ট সময়ে কোন বই খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুস্তক না থাকলে যেমন গ্রন্থাগার হয় না, তেমনি গ্রন্থাগারে পুস্তকের শ্রেণিকরণ না হলে গ্রন্থাগারিকতার ভিত্তি তৈরি হয় না। সেজন্য শ্রেণিকরণ গ্রন্থাগারের অপরিহার্য কাজ। একটি গ্রন্থাগারের শ্রেষ্ঠত্ব এর সংগ্রহে নয়, শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তার সেবায়। এ ক্ষেত্রে শ্রেণিকরণের প্রয়োজনীয়তা অধিক।

শ্রেণিকরণের সুবিধাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- বই দ্রুত খুঁজে পাওয়া যায়।
- কোন বিষয়ে কী কী বই আছে এবং কী কী নেই তা সহজেই জানা যায়।
- একই বিষয়ের বইগুলো একসঙ্গে এবং সম্পর্কযুক্ত বইগুলো পাশাপাশি থাকে।
- শ্রেণিনম্বর অনুযায়ী ইস্যুকৃত বই কার নিকট আছে তা সহজে জানা যায়।
- গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- বই যথাস্থানে রাখা যায়।
- বইয়ের মজুত প্রতিপাদন করা যায়।
- পাঠকের সময় বাঁচায়।
- বইগুলো নিয়ন্ত্রিত থাকে।

শ্রেণিকরণ পদ্ধতি :

লাইব্রেরির শেলফে বইগুলো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে সাজাতে হয়। বইগুলো যদি সুসংগঠিত না থাকে তাহলে যথাসময়ে তা ব্যবহারকারীর হাতে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয় না। বই পুস্তক এমনভাবে সাজানো থাকবে যাতে ব্যবহারকারী অল্প সময়ে বইটি খুঁজে পায়। বই শ্রেণিকরণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন-

- ডিউই ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন (DDC)।
- লাইব্রেরি অব কংগ্রেস ক্লাসিফিকেশন (LC)।
- ইউনিভার্সেল ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন (UDC)।
- কোলন ক্লাসিফিকেশন (CC)।
- বিবলিওগ্রাফিকেল ক্লাসিফিকেশন (BC) ইত্যাদি।

বই শ্রেণিকরণের জন্য DDC স্কিমই সর্বজনস্বীকৃত ও গৃহীত। ১৮৭৬ সালে আমেরিকার মেলভিল ডিউই এ শ্রেণিকরণ পদ্ধতিটি প্রণয়ন করেন। এটি আজ সারা বিশ্বের লাইব্রেরিগুলোতে ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের দেশেও এটি ব্যবহার করে আসছে।

শ্রেণিকরণ পদ্ধতি (ব্যবহারিক) :

মেলভিল ডিউই বিশ্বের সমগ্র জ্ঞানকে দশটি প্রধান বিভাগে ভাগ করেছেন। এ প্রধান ভাগগুলোকে 1st Summary বলা হয়। প্রধান বিভাগের প্রত্যেক বিভাগকে আরো দশ ভাগে ভাগ করে একশত ভাগ করেন। একে 2nd Summary বলা হয়। একশত ভাগের প্রত্যেক ভাগকে দশটি উপ-বিভাগে ভাগ করে এক হাজার উপ বিভাগ করেন। একে 3rd Summary বলা হয়। নিম্নের শ্রেণিকরণ পদ্ধতির ২টি Summary উল্লেখ করা হলো-

1st Summary – The 10 Main Class

000	সাধারণ জ্ঞান	500	বিজ্ঞান
100	দর্শন	600	প্রযুক্তি বিদ্যা
200	ধর্ম	700	কলা
300	সামাজিক বিজ্ঞান	800	সাহিত্য
400	ভাষা	900	সাধারণ ভূগোল ও ইতিহাস

2nd Summary – The 100 Division

000	**সাধারণ জ্ঞান**
010	গ্রন্থপঞ্জি
020	গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান
030	সাধারণ বিশ্বকোষিক রচনাবলি
040	বিবিধ সংগ্রহ
050	সাধারণ সাময়িকী এবং তার ইনডেক্স
060	সাধারণ সংঘ, সমিতি এবং জাদুঘর
070	সাংবাদিকতা, প্রকাশনা, সংবাদপত্র
080	সাধারণ সংকলন, সংগ্রহ, রচনা সম্ভার
090	পাণ্ডুলিপি ও দুষ্প্রাপ্য বই
100	**দর্শন এবং মনোবিজ্ঞান**
110	মেটাফিজিক্স
120	মানবতাবাদ
130	অস্বভাবিক বা আধা মনোবিজ্ঞান
140	নির্দিষ্ট দার্শনিক তত্ত্ব ও মতবাদ
150	মনোবিজ্ঞান
160	যুক্তিবিদ্যা
170	নীতি বিজ্ঞান
180	প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও প্রাচ্য দর্শন

190	আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন
200	**ধর্ম**
210	সহজাত ধর্ম
220	বাইবেল
230	খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব
240	খ্রিস্টধর্মে নৈতিকতা ও ঈশ্বরভক্তি, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব
250	স্থানীয় গির্জা ও ধর্মীয় নির্দেশ
260	সামাজিক ও গির্জা সংখ্যান্ত ধর্মতত্ত্ব
270	গির্জার ইতিহাস
280	খ্রিষ্ট সম্প্রদায় এবং গোত্র
290	অন্যান্য ও তুলনামূলক ধর্ম
300	**সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ**
310	পরিসংখ্যান
320	রাষ্ট্রবিজ্ঞান (রাজনীতি ও সরকার)
330	অর্থনীতি
340	আইনশাস্ত্র
350	লোক প্রশাসন
360	সমাজকল্যাণ
370	শিক্ষা
380	বাণিজ্য, যোগাযোগ, ট্রান্সপোর্টেশন
390	সামাজিক প্রথা, লোকজ সংস্কৃতি, লোক সাহিত্য
400	**ভাষা**
410	ভাষাবিদ্যা
420	ইংরেজি এবং অ্যাংলো স্যাক্সন ভাষা
430	জার্মান ভাষা
440	ফরাসি ভাষা
450	ইতালিয় ভাষা
460	স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষা
470	ল্যাটিন ভাষা
480	গ্রিক ভাষা
490	অন্যান্য ভাষা

500	**বিজ্ঞান**
510	অংকশাস্ত্র
520	জ্যোতির্বিদ্যা এবং সম্বন্ধযুক্ত বিজ্ঞান
530	পদার্থবিদ্যা
540	রসায়নবিদ্যা এবং সম্বন্ধযুক্ত বিজ্ঞান
550	ভূ-বিদ্যা, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান (পৃথিবী সংক্রান্ত বিজ্ঞান)
560	প্রত্ন জীববিজ্ঞান (জীবাশ্ম সংক্রান্ত বিজ্ঞান)
570	জীববিজ্ঞান
580	উদ্ভিদবিজ্ঞান
590	প্রাণিবিজ্ঞান
600	**প্রযুক্তিবিদ্যা (ব্যবহারিক বিজ্ঞান)**
610	চিকিৎসাবিজ্ঞান
620	ইঞ্জিনিয়ারিং
630	কৃষিবিজ্ঞান
40	গার্হস্থ্যবিজ্ঞান
650	ব্যবস্থাপনা ও সহায়ক সার্ভিসেস
660	কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
670	উৎপাদন
680	সুনির্দিষ্ট ব্যবহারের জন্য উৎপাদন
690	ইমরাত
700	**কলা**
710	শোভন শিল্পকলা, নগর ও প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যানুযায়ী অঙ্কিত শিল্পকলা
720	স্থাপত্য শিল্প
730	ভাস্কর্য, প্লাস্টিক আর্টস
740	অঙ্কন এবং অলঙ্করণ আর্টস
750	চিত্র ও চিত্রাঙ্কন
760	গ্রাফিক আর্টস
770	আলোকচিত্রবিদ্যা এবং আলোকচিত্র
780	সংগীত
790	বিনোদনমূলক এবং পারফর্মিং আর্টস
800	**সাহিত্য**

810	আমেরিকান সাহিত্য
820	ইংরেজি সাহিত্য
830	জার্মান সাহিত্য
840	ফরাসি সাহিত্য
850	ইতালি সাহিত্য
860	স্প্যানিশ পর্তুগিজ সাহিত্য
870	ল্যাটিন সাহিত্য
880	গ্রিক সাহিত্য
890	অন্যান্য ভাষায় রচিত সাহিত্য
900	**সাধারণ ভূগোল ও ইতিহাস**
910	ভ্রমণ
920	জীবনী
930	পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস
940	ইউরোপীয় ইতিহাস
950	এশিয়ার ইতিহাস
960	আফ্রিকার ইতিহাস
970	উত্তর আমেরিকার ইতিহাস
980	দক্ষিণ আমেরিকার ইতিহাস
990	পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সাধারণ ইতিহাস

ছোট আকারের লাইব্রেরিতে উল্লিখিত 1st Summary এবং 2nd Summary বই শ্রেণিকরণের জন্য যথেষ্ট।

শ্রেণিকরণের সহায়ক (Tools):

- Tables- V. 1
- Schedules- V. 2
- Index Manual
- Sears list of Subject headings.

<u>বইয়ের বিষয় শিরোনাম নির্বাচন : কৌশলে বই পড়া</u>

শ্রেণিকরণের লক্ষ্যে বইটাকে পড়ে নিতে হয়, আবার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করার জন্য বই পড়া আবশ্যক। বইয়ের সঠিক শ্রেণিকরণ নম্বর ব্যবহার করার জন্য বইটি বিষয় শিরোনাম নির্বাচন অত্যাবশ্যক। যিনি বইয়ের বিষয় শিরোনাম নির্বাচন করবেন তাঁকে সব বিষয়ে কিছু না কিছু ধারণা থাকতে হবে। সমস্ত বই পড়ে বিষয় বের করা সময়সাপেক্ষ। তাই দ্রুত কৌশলে বই পড়ে বইয়ের সঠিক বিষয় নির্বাচন করতে হবে।

১। বইয়ের মলাট / জ্যাকেট: বইয়ের সম্মুখ ও পিছনের Flap এ যথাক্রমে বইয়ের বিষয়বস্তু এবং লেখক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আকর্ষণীয় অথচ সুস্পষ্ট বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়। কখনো লেখকের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, লেখক প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের নাম ও তার সম্পর্কে বিশেষ কোন উদ্ধৃতি মলাটের শ্রীবৃদ্ধি করে। মনোযোগের সঙ্গে এসব তথ্যপাঠে বিষয়বস্তু এবং এই সম্বন্ধে ধারণা জন্মে।

২। *শিরোনাম :* একটি বই মূল্যায়ন ও নির্বাচন এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণ কার্যক্রমে শিরোনাম দ্বারা মাঝে মাঝেই বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা যায়। তবে সে ক্ষেত্রে শিরোনামের সঙ্গে বিষয়বস্তুর মিল থাকে না তখনই অসুবিধার সৃষ্টি হয় বেশি। বইয়ের শিরোনামের সঙ্গে অনেক সময়ই উপ শিরোনাম সংযুক্ত থাকে। সেটি বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণাও ব্যাখ্যা দেয়।

৩। *লেখকের যোগ্যতা :* শিরোনাম পৃষ্ঠায় অথবা পিছনের Flap এ লেখকের নামের সঙ্গে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, তিনি কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত লেখক হিসেবে তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা, বর্তমান ও অতীত পেশা ইত্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকে। বিষয়বস্তু নির্ধারণের সময় এসব তথ্য যথেষ্ট উপকারে আসে। অবশ্য মাঝেমধ্যে অন্যরকম যে হয় না তা নয়। কাজী আবদুল আলীম সংকলিত হাসির বিশ্বকোষ, বাণী চিরন্তনী ইত্যাদি খেলাধুলার বই নয়, যদিও তাঁর ও কাজী পরিবারের সকল সদস্য সদস্যাবৃন্দের খেলাধুলার ঐতিহ্যই বেশি।

৪। *উপক্রমণিকা :* মুখবন্ধ/উপক্রমণিকা/অবতরণিকা/ ভূমিকায় বই সম্বন্ধে লেখকের সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়। গ্রন্থাকার বা লেখক বইটি রচনার জন্য কীভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন, কীভাবে প্রেরণা পেলেন, কী উদ্দেশ্য সামনে রেখে তিনি বইটি রচনা করেছেন, বইটিতে কোন বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে, বইটি কাদের জন্য রচিত এ সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে। কাজেই উপক্রমণিকা পড়ে বইয়ের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ সম্ভব।

৫। *সূচিপত্র :* সূচিপত্র বইয়ের সিলেবাস। বইয়ের অভ্যন্তরে কোন পাতায় কি আছে ব্যাপক অর্থে তার নির্দেশ দেয়াই সূচিপত্রের কাজ। সূচিপত্র বইয়ের বিষয় নির্ধারণে যথেষ্ট সন্নিবিষ্ট হয়। আধুনিককালে মুদ্রিত বইয়ের জন্য তাই বিষয় নির্ধারণ কার্যক্রম আর কঠিন মনে হয় না।

৬। *নির্দেশক/ নির্ঘন্ট :* বইয়ের অন্তর্ভুক্ত সকল স্থান কালপাত্র ঘটনার পৃষ্ঠা নির্দেশসহ বর্ণানুক্রমিক তালিকার নির্দেশক। কেউ কেউ এটিকে নির্ঘন্ট বলেও অভিহিত করেন। সাধারণত নির্দেশক থাকে বইয়ের শেষে। বিষয়বস্তু নির্ধারণে নির্দেশকের ভূমিকা অপরিসীম, কোন কোন রেফারেন্স গ্রন্থে বইয়ের প্রথমেও নির্দেশক উপস্থাপিত হয়।

৭। মূল বক্তব্য : বর্ণিত উপায়গুলোর সাহায্যে যদি কেউ বইটি সম্বন্ধে ধারণা লাভে অসমর্থ হন তবে মূল বইটি পড়েই তিনি বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবেন।

৮। পুস্তক সমালোচনা : ইদানীং পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে নতুন বইয়ের উপর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এগুলো সংগ্রহ করে রাখলে বইয়ের উপর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে। এ সমস্ত সমালোচনা বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি প্রচ্ছন্ন ধারণা দেয়।

৯। বিশেষজ্ঞের উপদেশ : যেহেতু সকলে সব বিষয়ে সমান জ্ঞান রাখে না এবং সমান পারদর্শী নন, তাই জটিলতার সৃষ্টি হলে যথাসম্ভব বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেয়া উচিত।

১০। রেফারেন্স বইয়ের সাহায্য গ্রহণ : গ্রন্থাগারের প্রস্তুতিকরণ কার্যক্রম বিভিন্ন প্রকার রেফারেন্স গ্রন্থ উত্তম সহায়ক হিসেবে কাজ করে। পুস্তক মূল্যায়ন ও নির্বাচন, পুস্তকের শ্রেণিকরণ ও লিখন তৈরি ইত্যাদি সর্বদাই অভিধান, গ্রন্থপঞ্জি বিষয় শিরোনামের উপর রচিত গ্রন্থ, জীবনীকোষ এসব বইপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরোক্ত উপাদানগুলোর নিরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়বস্তু নিশ্চিত হতে না পারলে বইয়ের মূল বিষয়বস্তু পড়ে বিষয় নির্বাচন করতে হবে।

শ্রেণিকরণ নম্বর ব্যবহার :

বিষয় শিরোনাম নির্বাচনের পর শ্রেণিকরণ তফসিল অনুসরণ করে বিষয় শিরোনামের সঠিক শ্রেণিকরণ নম্বর বসাতে হয়। নম্বর কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তার নির্দেশনাবলি তফশিলে দেয়া আছে।

ক্যাটালগ ও লেনদেন পদ্ধতি

ক্যাটালগ (Catalogue)ঃ

মানব সভ্যতার গোড়া পত্তনকালে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ছিল নির্দিষ্ট গন্ডিতে আবদ্ধ এবং জ্ঞান প্রকাশের মাধ্যম ছিল মৌখিক। যুগে যুগে কালে কালে মানুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভান্ডার যত সমৃদ্ধি পেতে থাকলো, ক্রমবর্ধমান তথ্যের চাপও বাড়াতে থাকলো ক্রমশ। ফলে স্মৃতিতে সবকিছু আর ধরে রাখা সম্ভব হলো না, প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল সেসব জ্ঞানভান্ডারকে লিখিত রূপ দেয়ার। কালের আবহমান ধারায় এবং ক্রমবিকাশের বিচিত্র রূপায়ণে সঞ্চিত জ্ঞানভান্ডার সংগৃহীত হয়ে রূপ নেয় গ্রন্থাগারের। প্রয়োজন হয়ে পড়ে তালিকা সংরক্ষণের। এমনই ভাবে সংগ্রহের তালিকাসমূহ অবয়ব পায় বিভিন্ন রূপে। সংগৃহীত তথ্যরাজির তালিকা প্রস্তুতকরণ তথা ক্যাটালগিং এমনভাবে ব্যবহারে এলো মানুষের কাছে।

লাইব্রেরি ক্যাটালগ বস্তুত লাইব্রেরি গ্রন্থরাজির একটি সুষ্ঠু এবং সুসংবৃদ্ধ তালিকা। এর দ্বারা একজন ব্যবহারকারী কোন নির্দিষ্ট লাইব্রেরিতে কী কী উপকরণ রয়েছে তা জানতে পারে। পুস্তক তালিকার উদ্দেশ্য কোন গ্রন্থাগারে কোন কোন ধরনের কী কী পুস্তক এবং কোন কোন লেখকের কী কী পুস্তক আছে তা পাঠক এবং ব্যবহারকারীদের সামনে বিশেষ বিবরণের মাধ্যমে তুলে ধরা। এই বিবরণ সাধারণত পূর্ব নির্ধারিত সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহকারে বর্ণানুক্রমিক উপায়ে সাজানো থাকে।

লাইব্রেরি ক্যাটালগে একটি বই বা উপকরণের লেখক, শিরোনাম, উপ-শিরোনাম, সংস্করণ, প্রকাশের স্থান, প্রকাশক, প্রকাশের তারিখ, পৃষ্ঠা, সম্পাদক, অনুবাদক, সংগ্রাহক, সংকলক, যুগ্ম লেখক, বিষয় ও সম্ভাব্য তথ্যাবলিসহ বিভিন্ন শিরোনামে পূর্ব নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ ও সাজানো থাকে। যেকোন পাঠক/ ব্যবহারকারী তার কাঙ্ক্ষিত বইপত্রের সন্ধান লাভের উদ্দেশ্যে ক্যাটালগে বর্ণিত যে কোন শিরোনামে খুঁজতে পারে। এজন্যই লাইব্রেরি ক্যাটালগের অপর নাম পুস্তক সম্ভারের চাবিকাঠি। এটি না হলে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয় না।

এ কারণেই ক্যাটালগবিহীন গ্রন্থাগারকে বইপত্রের স্তূপ মাত্র বলতে দ্বিধা করে না। পাঠক/ ব্যবহারকারীদের যদি গ্রন্থাগারের উপকরণসমূহের সন্ধান নেয়া আবশ্যক হয় তাহলে ক্যাটালগের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

ক্যাটালগ হলো :

- বইয়ের একটি পদ্ধতিগত তালিকা।
- বইয়ের তালিকা যা একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা বিধান অনুসারে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।
- লাইব্রেরি অন্তর্ভুক্ত সকল সংগ্রহের একটি সুসংবদ্ধ ও বিন্যস্ত তালিকা।
- একটি নির্দিষ্ট বইয়ের গ্রন্থপঞ্জিগত তথ্য নিয়ে কোড অনুসারে বিন্যস্ত তালিকা।

ক্যাটালগ কেন?

- বইয়ের পরিচিতি তুলে ধরে।
- বইয়ের সঠিক অবস্থান নির্দেশ করে।
- দ্রুত বই খুঁজে বের করার একটি কৌশল।
- ব্যবহারকারীর সময় বাঁচায়।
- এর মাধ্যমে লাইব্রেরিতে কোন কোন ধরনের বই আছে তা জানা যায়।
- এটি গবেষণার কাজকে ত্বরান্বিত করে।

ক্যাটালগের প্রকারভেদ:

দৈহিক গঠন অনুযায়ী ক্যাটালগ ৩ প্রকার।
যথা-

১। বুক ক্যাটালগ/রেজিস্টার ক্যাটালগ
২। শিফ ক্যাটালগ
৩। কার্ড ক্যাটালগ

১। বুক ক্যাটালগ :

পৃথক পৃথক ছোট ছোট স্লিপে নির্দিষ্ট নিয়মে বইয়ের প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে তালিকা সম্পন্ন করে বই আকারে প্রকাশ করা হয়। যে সকল লাইব্রেরি মুদ্রণ খরচ যোগাতে পারে না তারা নির্দিষ্ট নিয়মে বইয়ের প্রয়োজনীয় এন্ট্রিসমূহ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রেজিস্টারে ক্যাটালগ তৈরি করে থাকেন।

২। শিফ ক্যাটালগ :

প্রতিটি বইয়ের জন্য পৃথক স্লিপে লিখন সম্পন্ন করে যে তালিকা তৈরি করা হয় তাকে শিফ ক্যাটালগ বলে। এ পদ্ধতিতে লিখনের কাজ সমাপ্ত হলে স্লিপগুলো একত্রে করে কোন হুক/পুজলিফ মলাটের মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয়।

৩। কার্ড ক্যাটালগ :

বিশ্বে আধুনিক লাইব্রেরিগুলোতে কার্ড ক্যাটালগের ব্যবহার অধিক প্রচলিত। এর ব্যবহার উপযোগিতা এ পদ্ধতিকে অধিক কার্যকর করেছে। প্রতিটি বইয়ের গ্রন্থপঞ্জিগত তথ্যগুলো পৃথক পৃথক কার্ডে লিখন সম্পন্ন করে এ ক্যাটালগ তৈরি করা হয়। কার্ডগুলোর পরিমাপ হচ্ছে ৫″× ৩″।

ক্যাটালগ প্রস্তুত প্রণালী (ব্যবহারিক) :

লাইব্রেরি ক্যাটালগকে তথ্য অনুসন্ধানের যন্ত্র বলা হয়। সঠিকভাবে ক্যাটালগ প্রস্তুত করা না হলে লাইব্রেরির ব্যবহার ফলপ্রসূ হবে না, এটি প্রস্তুত করতে কতগুলো বিধিবদ্ধ নিয়ম মেনে চলতে হয়। ১৯৬৭ সালে ALA, LA, LC ও CLA- এর সম্মিলিত প্রচেষ্টার Anglo American Cataloguing Rule (AACR) প্রকাশ করেন। সমগ্র বিশ্ব এটিকে সাদরে গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের লাইব্রেরিগুলোতে এটি ব্যবহার করা হয়। ১৯৭৮ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ AACR-2 প্রকাশিত হয়।

৫′′×৩″

ডাক সংখ্যা[১]	লেখক:	নামের শেষাংশ, নামের প্রথমাংশ[২]
		শিরোনাম[৩] ....
	....	.....:উপ-শিরোনাম[৪]...............................
	....	...(যদি থাকে)/ লেখকের নাম[৫] ....
	....	সংস্করণ[৬].............প্রকাশের স্থান[৭]................
	....	প্রকাশক[৮] .... প্রকাশকাল[৯]..................
		পৃষ্ঠা বর্ণনা[১০].......... চিত্র বর্ণনা[১১].................
		আকার[১২]............. (সিরিজ[১৩]..................).
	....	গ্রন্থপঞ্জি[১৪]:..
		আইএসবিএন[১৫].....................................
		ট্রেসিং[১৬]..
		....

ট্রেসিং

৫′′×৩″

১. বিষয় শিরোনাম (আরবি সংখ্যায়).....................

ক. অতিরিক্ত লিখন (যুগ্ম লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক ইত্যাদি) (যদি থাকে)। খ. শিরোনাম।

গ. সিরিজ

১। *ডাক সংখ্যা (Call No) :* Call number এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ডাক সংখ্যা। একটি বইয়ের শ্রেণি নম্বরের সঙ্গে Author marks, book marks সাময়িকীর ক্ষেত্রে সন ইত্যাদি যা ক্যাটালগ কার্ডের বাম পাশের উপরের কোনায় লেখা হয়ে থাকে Call no তাকেই বলে। অর্থাৎ Call no = Classification no + Author/book marks. প্রচলিত চর্চা অনুসারে, সাধারণত লেখকের নামের ২ অক্ষর এবং বইয়ের নামের ১ অক্ষর (আর্টিক্যাল বাদে) দিয়ে কল নম্বর সাজানো হয়। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পস্ট হবে। যেমন– A Text book of economics, by Ahmed Zobair বইটির বিষয় অর্থনীতি, ডিডিসি অনুসারে শ্রেণি নম্বর ৩৩০। সুতরাং কল নম্বর হবে-

Particulars			Call No.
Economics =	Subject	330	330
Zobair, Ahmed =	Author	ZO	ZOT
Text Book =	Title	T	

অনুরূপভাবে বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য। বই এবং লেখকের নাম থেকে আ-কার, ও-কার ইত্যাদি বাদ দিয়ে শুধু মৌলিকবর্ণ গ্রহণ করে সে-সব এনে ডিডিসি বিষয় নম্বরের সঙ্গে যুক্ত করে কল নম্বর তৈরি করতে হবে।

২। *লেখক (Author) :* সৃষ্টিশীল চিন্তা-ভাবনা ও ধারণাসমূহ পুস্তকাকারে অস্তিত্বে আনার জন্য কৃতিত্ববান ব্যক্তি বা সংস্থাকে লেখক বলে। একটি বইয়ের একজন বা একাধিক লেখক থাকতে পারেন। ইংরেজিতে এদেরকে যথাক্রমে Single author, double author, Triple author, এবং তিনের অধিক হলে more Than Triple author নামে চিহ্নিত করা হয়। তবে লেখক একের অধিক হলে প্রথম লেখককেই প্রধান লেখক এবং তার নামেই প্রধান লিখন তৈরি করা হয়। আবার রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় কোন বিভাগ, সংঘ বা সংস্থা, কোন প্রতিষ্ঠান বা এদের অনুমোদনে যখন কোন বই প্রকাশিত হয় তখন ঐ রাষ্ট্র, বিভাগ বা সংঘকে Corporate author বলা হয়। সাধারণত লেখকের নাম বইয়ের শিরোনামের (টাইটেল) নিচে, স্পাইনে অথবা বইয়ের পিছনে অন্তর্ভুক্ত থাকে। ক্যাটালগ কার্ডে প্রথম ইন্ডেনশন থেকে লেখকের নাম শুরু করতে হবে। কোনক্রমে যদি লেখকের নাম এক লাইনে শেষ না হয় তবে পরবর্তী অংশ তৃতীয় ইন্ডেনশন থেকে লিখে শেষ করতে হবে। লেখকের নামের সঙ্গে কোন ডিগ্রি সংযুক্ত করা যাবে না। যেমনঃ এম. এ., পি. এইচ.ডি., এম. এস. সি. ইত্যাদি ডিগ্রি পরিত্যাজ্য।

৩-৪। *শিরোনাম (Title) ও উপ-শিরোনাম (Sub-title) :* শিরোনাম বা আখ্যা হচ্ছে কোন পুস্তকের নাম। লেখক তার বইয়ের যে নাম রাখেন তাকেই উক্ত বইয়ের শিরোনাম বা আখ্যা বলা হয়। একটি বইয়ের এক বা একাধিক শিরোনাম থাকতে পারে তবে মূল শিরোনাম একটিই থাকে। পুস্তকের মূল নামের ব্যাখ্যা হিসাবে যে অংশটি ব্যবহার করা হয় তাকে উপ-শিরোনাম বলে। একটি শিরোনামের অধীন এক বা একাধিক উপ-শিরোনাম থাকতে পারে। উপ-শিরোনাম খুঁজে বের করা কঠিন নয়। তবে মাঝে মাঝে সিরিজ, উপ-শিরোনাম এবং শিরোনামকে শিক্ষার্থীরা একত্রে মিশিয়ে জটিল অবস্থা সৃষ্টি করে। শিরোনাম সাধারণত বড় অক্ষরে মলাটের উপরে, ভিতরের পাতায় (শিরোনাম পাতায়), এবং স্পাইনে উল্লেখ থাকে। সিরিজ এবং উপ-শিরোনাম সাধারণত একটু ছোট অক্ষরে থাকে। তাছাড়াও সিরিজের সাথে অনেক সময় সিরিজ সংখ্যা উল্লেখ থাকে, যা শিরোনামে কখনো থাকে না। হাফ- টাইটেল পৃষ্ঠার উপরের দিকে সিরিজ এবং টাইটেল পৃষ্ঠায় টাইটেলের ঠিক নিচে উপশিরোনামে থাকে। কার্ডের দ্বিতীয় ইন্ডেনশন থেকে শিরোনাম শুরু হবে। শিরোনাম এক লাইনে শেষ না হলে পরবর্তী অংশ প্রথম ইন্ডেনশনে চলে আসবে। শিরোনাম/উপ-শিরোনাম যদি অধিক দীর্ঘ হয়, সেক্ষেত্রে শিরোনাম/উপ-শিরোনাম–এর প্রথম ৫টি শব্দ রেখে বাকিগুলো বাদ দিয়ে তিনটি (...) দিয়ে তারপর শেষের দিকে ২/৩টি শব্দ উল্লেখ করতে হবে।

৫। লেখকের নাম (Author’s name) : ২নং আইটেমে লেখকের সার্বজনীনতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এখানে আলোচনা হবে তার ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে। অর্থাৎ, ক্যাটালগ কার্ডের অভ্যন্তরে লেখকের নাম কিভাবে লেখা হবে। লেখক নিজে তার নাম যেভাবে লেখেন, সেভাবেই কার্ডের বডিতে লেখকের নাম লেখা হবে। লেখক দু’জন হলে প্রথম লেখক-এর নামের পর ইংরেজিতে ‘and’ ও বাংলায় ‘এবং’ হবে। লেখক তিনজন হলে প্রথম লেখকের নামের পর (,) কমা, দ্বিতীয় লেখকের নামের পর ইংরেজিতে ‘and’ ও বাংলায় ‘এবং’ হবে। এ ছাড়া ক্যাটালগ এন্ট্রির অন্য সকল নিয়ম ঠিক থাকবে।

৬। সংস্করণ : (Edition) : Edition শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো সংস্করণ। একটি বইয়ের একই সময়ে ছাপা সমুদয় কপি। একটি বই প্রথম প্রকাশিত হবার পর পরবর্তীতে ব্যাপক আকারে পরিবর্তিত মুদ্রণে প্রকাশ করাকে সংস্করণ বলে। বইয়ের শিরোনাম পৃষ্ঠায় অথবা তার পরের পাতায় (Verso-ভারসো) সংস্করণ উল্লেখ থাকে। ক্যাটালগ কার্ডে সংস্করণেকে সংক্ষেপে Edn. দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সংস্করণ উল্লেখ করার সময় তার আগে ডট, স্পেস, ডাবল হাইফেন স্পেস (. --) দিতে হবে এবং এটা যথাসম্ভব সংক্ষেপিত হবে। যেমন– (ইংরেজি হলে), 1st, 2nd, 3rd, ed. ইত্যাদি।

৭। স্থান (Place of Publication) : একটি বই যে স্থান থেকে প্রকাশিত হয় তাকেই প্রকাশের স্থান বলা হয়। বইয়ের শিরোনাম পৃষ্ঠার নিচের দিকে পুস্তক প্রকাশের স্থানটি উল্লেখ থাকে। অনেক বইয়েই একাধিক স্থানের নাম থাকে এমতাবস্থায় যে নামটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং সবার নিকট পরিচিত তাকেই Place of Publication বা পুস্তক প্রকাশের স্থান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। যদি ক্যাটালগার স্থানের প্রসিদ্ধতা বুঝতে না পারেন, তবে স্থানের যে নামটি প্রথমে দেয়া আছে, ক্যাটালগ কার্ডে তার উল্লেখ করতে হবে। এমন যদি হয় যে, স্থানের নাম উল্লেখ নেই সে ক্ষেত্রে তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরে [s.l.] লিখতে হবে। প্রায়ই শিরোনাম পৃষ্ঠার নিচে প্রকাশনা সংস্থার নামের সঙ্গে স্থানের নাম উল্লেখ থাকে। তাছাড়াও শিরোনাম পৃষ্ঠার পরের পাতায় যেখানে সংস্করণ এবং আনুষঙ্গিক তথ্যাদি সম্পর্কে লেখা হয়, সেখানেও স্থানের নাম উল্লেখ থাকে।

৮। প্রকাশক (Publisher) : Publisher শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রকাশক। প্রকাশক এক অথবা একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে পারে। আবার যিনি প্রকাশক তিনি আবার মুদ্রকও হতে পারেন। তবে আধুনিক বইয়ে প্রকাশক ও মুদ্রক সাধারণত এক ব্যক্তি হন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন বই এর শিরোনাম পৃষ্ঠার নিচে অথবা তার পরের পৃষ্ঠায় প্রকাশনা সংস্থার নাম উল্লেখ থাকে। তা না হলে বইয়ের স্পাইনে প্রকাশকের নাম উল্লেখ থাকে। যদি কোন বইয়ের প্রকাশক দেওয়া না থাকে সেক্ষেত্রে এর স্থলে তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরে [ং.হ.] লিখতে হবে। অর্থাৎ প্রকাশেকের নাম নেই (no name of publishers)। ক্যাটালগ কার্ডে প্রকাশকের নাম যথাসম্ভব সংক্ষেপিত আকারে উল্লেখ করতে হবে। যেটুকু আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত বা পরিচিত সেটুকু উল্লেখ করলেই চলবে।

৯। প্রকাশের তারিখ (Year of Publication or Date of Publication) : পুস্তক প্রকাশের তারিখ বলতে আমরা পুস্তক প্রকাশের সালকে বুঝে থাকি। পুস্তক প্রকাশের সাল সাধারণত পুস্তকের শিরোনাম পাতা (টাইটেল পেজ) এর নিচে বা নামের পাতার পিছনে থাকে। পুরাতন বইয়ের প্রকাশকের সঙ্গে থাকে পুস্তক প্রকাশের দিন, মাস ও সাল। কোন কোন ক্ষেত্রে পুস্তক প্রকাশের সাল খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি বইয়ের ক্যাটালগ করতে হলে যতদূর সম্ভব প্রকাশ কাল খুঁজে লিখতে হয়। আর কোনভাবেই সাল খুঁজে না পাওয়া গেলে সালের জায়গায় প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এভাবে লিখে দিতে হয়। প্রকাশকাল না থাকলে কপিরাইটের সন লিখতে হবে।

১০। *পৃষ্ঠা সংখ্যা (Pagination) :* ক্যাটালগ কার্ডের যে জায়গায় একটি বইএর পৃষ্ঠা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় তাকেই Pagination বলে। Pagination এর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে ক্যাটালগার বিপাকে পড়ে যান। যেমন- আমরা সাধারণত দেখি অধিকাংশ বইয়ের প্রথম দিকের পৃষ্ঠাগুলো রোমান হরফে পৃষ্ঠাঙ্কিত থাকে। কিন্তু এমনও হয় মাঝে মাঝে কোন বইয়ের প্রথম দিকের কিছু পৃষ্ঠায় কোন পৃষ্ঠা নম্বর দেয়া থাকে না অথবা A, B, C, D ইত্যাদি দিয়ে পৃষ্ঠা চিহ্নিত করা হয়। এসব ক্ষেত্রে একজন ক্যাটালগার তার ক্যাটালগ কার্ডের Pagination করতে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন যদি কোন বইয়ে পৃষ্ঠানম্বর না থাকে নিয়মানুসারে পৃষ্ঠা গণনা করে করতে হয়। আবার যদি পৃষ্ঠা সংখ্যা A, B, C, D ইত্যাদি এরকম হয় তাহলে শুরু করে যে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে তাই লিখতে হয়।

যেমন মনে করি, একটি বইয়ের প্রথম দিক থেকে কিছু পৃষ্ঠা A, B, C, D ইত্যাদি দিয়ে শুরু করে M পর্যন্ত গিয়ে শেষ করেছে তাহলে এসব ক্ষেত্রে Pagination এ M লিখতে হবে। প্রত্যেক বইয়ে দু'ধরনের পৃষ্ঠা থাকে, যেমন- প্রাথমিক পৃষ্ঠা ও মূল পৃষ্ঠা। সাধারণত ইংরেজি বইয়ে প্রাথমিক পৃষ্ঠাগুলো রোমান সংখ্যায় থাকে। এক্ষেত্রে পৃষ্ঠাগুলো দ্বিতীয় ইন্ডেনশন থেকে শুরু হবে। প্রথমে প্রাথমিক পৃষ্ঠা উল্লেখ করার পর মূল পৃষ্ঠা উল্লেখ করতে হবে। প্রাথমিক পৃষ্ঠার পর একটি কমা (,) হবে এবং মূল পৃষ্ঠার পর ইংরেজি পি (p.) হবে। যেমনঃ XII, 240p.; অপরদিকে বাংলা বইয়ে যদি প্রাথমিক পৃষ্ঠা কথায় লেখা থাকে তবে সর্বশেষ প্রাথমিক পৃষ্ঠা উল্লেখ করে কমা (,) দিয়ে মূল পৃষ্ঠা লিখতে হবে। যেমন- পনের, ৪৫০ পৃ.। আবার প্রাথমিক পৃষ্ঠা যদি বাংলা হরফে থাকে তবে শেষ হরফটি উল্লেখ করে কমা (,) দিয়ে মূল পৃষ্ঠা লিখতে হবে। যেমন- জ,৩৫০ পৃ.।

১১। *চিত্রকর্ম (Illustration):* কোন বইয়ের বর্ণনামূলক ছবি, ছক, প্ল্যান ইত্যাদিকে Illustration বলে। এটাকে সংক্ষেপে ill. লেখা হয়ে থাকে। সকল বইয়ে থাকে না। বইয়ে চিত্রকর্ম থাকলে অবশ্যই ক্যাটলগ কার্ডে তা লিখতে হবে। না থাকলে লিখার কোন প্রয়োজন নেই। এতে ক্যাটালগ কার্ড অসম্পূর্ণ থাকবে না।

১২। *আকার (Size):* পুস্তকের উচ্চতা অনুসারে পুস্তকের মাপ নির্ণয় করাকে ক্যাটালগিং-এর ভাষায় আকার বা *Size* বলা হয়। পুস্তকের মলাট উচ্চতার ৩/৫ অংশের কম চওড়া হলে বইখানিকে বলা যায় সরু। ৩/৪ অংশের বেশি হলে বলা হয় চৌকা ও উচ্চতা অপেক্ষা বেশি চওড়া হলে বলা হয় আয়তকার। ক্যাটালগ কার্ডে বইয়ের মাপ সাধারণত সেন্টিমিটারে উল্লেখ করতে হয়। যদি কোন বইয়ের বেদ উচ্চতার চেয়ে অর্ধেক কম হয় সেক্ষেত্রে সাইজ লেখার সময় গুণন চিহ্ন দ্বারা পুরো সাইজ লিখতে হবে। যেমন- কোন বইয়ের সাইজ ২৫ সেমি ও ১২ সেমি হয় তবে এভাবে উল্লেখ করতে হবে ২৫×১২ সেমি। আবার যদি বেদ অর্ধেক বা তদূর্ধ্ব হয় সেক্ষেত্রে শুধু উচ্চতা লিখতে হবে। যেমন– ধরা যাক কোন বইয়ের সাইজ ৩০ সেমি ও ১৬ সেমি এক্ষেত্রে সাইজের জায়গায় কার্ডে শুধু ৩০ সেমি লিখতে হবে।

১৩। *সিরিজ :* পুস্তকমালা অর্থাৎ কোন বিষয়ের বিভিন্ন শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত কোন প্রকাশকের প্রকাশনাসমূহ। এতে প্রত্যেকটি বইয়ে পুস্তকমালার নাম থাকে। ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধের বই নির্ধারিত সময়ে প্রকাশিত পত্রিকার বিভিন্ন পর্যায়ক্রম, একই লেখকের একই ধরনের গল্প বা প্রবন্ধ পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রকাশিত ইত্যাদি সবকিছুই সিরিজের অন্তর্ভুক্ত। যেমন– মাসুদ রানা বইয়ের সিরিজসমূহ। সিরিজ খুঁজে বের করতে শিক্ষার্থীদের একটু সমস্যায় পড়তে হয়। অনেক সময় সিরিজ, শিরোনাম এবং উপ-শিরোনাম এমনভাবে লেখা থাকে যে কোনটি সিরিজ, কোনটি শিরোনাম, কোনটি উপ-শিরোনাম তা খুঁজে বের করা জটিল। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই সিরিজের শেষে সিরিজ নম্বর উল্লেখ থাকে। এটা দেখেও সিরিজ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। কোন কোন সময় বইয়ের কভার পেইজের (মলাটের) উপর আবার কখনো শিরোনাম পৃষ্ঠার নিচেই সিরিজ উল্লেখ থাকে কার্ডে সিরিজ লেখার সময় তার আগে ও পরে (২ স্পেস) জায়গা ছাড়তে হবে।

১৪। *গ্রন্থপঞ্জি* : গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি বই লিখতে লেখক যেসব প্রকাশনার সহায়তা নিয়ে থাকেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আরও তথ্য পেতে হলে যেসকল বইয়ের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে তার তালিকাকেই গ্রন্থপঞ্জি বলে। বইয়ে এ উপকরণটি গ্রন্থাগার-সূচির সঙ্গে লিখে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। তাছাড়া অনেক সময় লেখক প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে গ্রন্থপঞ্জি লিপিবদ্ধ করে থাকেন। ক্যাটালগে গ্রন্থপঞ্জির পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হয়। যেমন– গ্রন্থপঞ্জি : পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৭৬৫-৭০।

কার্ডে বিবলিওগ্রাফি উল্লেখ করার নিয়ম হলো :

১. অনিয়মিত বা অনির্ধারিত গ্রন্থপঞ্জি থাকলে লিখতে হবেঃ গ্রন্থপঞ্জি সম্বলিত।

২. প্রতি অধ্যায়ের শেষে থাকলেঃ প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে গ্রন্থপঞ্জি।

৩. বইয়ের শেষ অধ্যায়ের শেষে থাকলেঃ শেষ অধ্যায়ের পরে গ্রন্থপঞ্জি।

৪. নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় থাকলে পৃষ্ঠা উল্লেখ করতে হবে।

১৫। ISBN & ISSN আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পুস্তক সংখ্যা এবং আন্তর্জাতিক মানসম্মত সাময়িকী সংখ্যা। আধুনিককালে বিশেষ করে ১৯৭০ সালের পর প্রকাশিত বই এবং সাময়িকীতে ISBN & ISSN অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উভয় নম্বরেরই গুরুত্ব রয়েছে। আর এজন্যই ক্যাটালগে ISBN & ISSN নম্বর অন্তর্ভূক্ত করতে হয়।

এর মাধ্যমে জার্নালটি এবং বইটি কোথা থেকে বের হয়েছে, প্রকাশকের নাম এবং তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা জানা যায়। ISBN সাধারণত বইয়ের প্রকাশকের নিচে অথবা বইয়ের পেছনের মলাটে উল্লেখ থাকে। কার্ডের সম্পূর্ণ এন্ট্রি শেষে দ্বিতীয় ইন্ডেনশনে ISBN নম্বর উল্লেখ করতে হয়। বাংলা বইয়ে ISBN যদি ইংরেজিতে থাকে তবে তা ইংরেজিতেই উল্লেখ করতে হবে।

১৬। *ট্রেসিং :* গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের ভাষায় ট্রেসিং হচ্ছে বিভিন্ন লিখন বা অতিরিক্ত ক্যাটালগ কার্ডের সন্ধান প্রদানকারী উৎস। ট্রেসিং সাধারণত: দুটি অংশে বিভক্ত থাকে।

প্রথম অংশে Description থাকে যাকে আমরা বিষয় শিরোনাম বলে থাকি। মাঝারি আকারের বা ছোট লাইব্রেরির জন্য যেকোন বইয়ের সর্বোচ্চ তিনটি শিরোনাম নির্ধারণ করাই বাঞ্ছনীয়। তবে যদি বইটির জন্য কোন অতিরিক্ত এন্ট্রি তৈরি না করতে হয় তবে একটি বিষয়ে শিরোনাম ব্যবহার করলেও অসুবিধা নেই। এই বিষয়ে শিরোনামগুলোকে সাধারণতঃ Arabic Numerals ১, ২, ৩ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করতে হয়। বিষয় শিরোনামের পর অতিরিক্ত লিখনের জন্য যথা-যুগ্ম লেখক, সম্পাদক, আখ্যা, সিরিজ (Roman Numarals i,ii,iii) ইত্যাদি দ্বারা লিখতে হয়। ক্যাটালগের ট্রেসিং অংশটুকুই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপর্যুক্ত উপাদানগুলো ছাড়াও প্রধান ক্যাটালগ কার্ডের নিচে এবং ট্রেসিং এর উপরের অংশে একটি গোল চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার্থীরা এই চিহ্নটি নিয়েও বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করে। আসলে এই চিহ্নটি নিয়ে এতো চিন্তা ভাবনা করার কোন কারণ নেই। এটা একটা ছিদ্র মাত্র। ক্যাটালগ ক্যবিনেটে কার্ডগুলো সুন্দর অবস্থানের নিমিত্তে এবং কার্ডগুলো যাতে স্থানচ্যূত হতে না পারে তার জন্য একটি খুব সরু পিতল/ লোহার রড় কার্ডগুলোর ভিতর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং এই গোল চিহ্নটি শিক্ষার্থীর নিকট এখন আর আশ্চর্যের বা ভয়ের কোন উপাদান হবার কথা নয়।

প্রধান লিখনের কার্ড ক্যাটালগ প্রস্তুতকরণ (ব্যবহারিক) :

সমস্যা (Problem) :

- কবি জসীম উদ্‌দীন রচিত সুজন বাদিয়ার ঘাট বইটির প্রকাশক পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ষোড়শ সংস্করণ। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬০, ছবিসহ ২০০২ এ প্রকাশিত হয়েছে।
- A Text book of Advanced Functional English written by A H M Mohiuddin and AFM Abul Kasem, Publication of Ideal Library, Dhaka, 1995 Twenty sixth edition October, composed by Noble Printers, Pagination XXIV. and pages 420 with Board questions in 16 pages.

ক্যাটালগ কার্ড বিন্যাস পদ্ধতি:

- প্রধান এন্ট্রি ও অতিরিক্ত এন্ট্রির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক কার্ড প্রয়োজন হয়।
- এন্ট্রি তৈরি শেষে কার্ডগুলোর লিখন শিরোনাম বর্ণানুμমিকভাবে (Alphabetically) সাজাতে হয়।
- কার্ড বিন্যাস হবে Letter by letter পদ্ধতিতে।
- ব্যবহারের সুবিধার জন্য কার্ডগুলো ক্যাটালগ ক্যাবিনেটে সংরক্ষণ করা হয়।

শেলফে বই বিন্যাস পদ্ধতি :

বইয়ের স্পাইনে ডাক সংখ্যা বসানোর পর বইগুলো বইয়ের শেলফে শ্রেণিকরণ নম্বরের ক্রমঅনুযায়ী সঠিকভাবে সাজাতে হয়। একই শ্রেণিকরণ নম্বরের একাধিক বই হলে বই সংখ্যার বর্ণানুক্রমিকভাবে বা অ্যালফাবেটিক্যালি সাজাতে হয়।

বই লেনদেন (Circulation) :

প্রত্যেক লাইব্রেরিতে একটি পৃথক লেনদেন বিভাগ থাকে। এখান থেকে পাঠক বা ব্যবহারকারীদের নিকট বই ইস্যু করা হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর বই ফেরত নেয়া হয়। বই ইস্যু পদ্ধতি লাইব্রেরির আকার, পাঠক সংখ্যা, কর্মচারীর সংখ্যা, আর্থিক মঞ্জুরী, প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। বই ইস্যুর বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন–

- ব্রাউন চার্জিং পদ্ধতি
- নেওয়ার্ক চার্জিং পদ্ধতি
- ডিকম্যান বুক চার্জিং পদ্ধতি
- ফটো চার্জিং পদ্ধতি
- অডিও চার্জিং পদ্ধতি
- কম্পিউটার চার্জিং পদ্ধতি
- বই ইস্যু রেজিস্টার পদ্ধতি ইত্যাদি

(দেশীয় ছবি হবে।)

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্রাউনিং চার্জিং পদ্ধতি বহুল প্রচলিত।

ব্রাউন চার্জিং পদ্ধতি :

প্রয়োজন :

১। বইয়ের জন্য প্রয়োজন হয় বুক পকেট, বুক কার্ড ও তারিখ পত্র।

❒ বুক পকেট: এটি বইয়ের পেছনের মলাটের ভিতর লাগানো হয়।

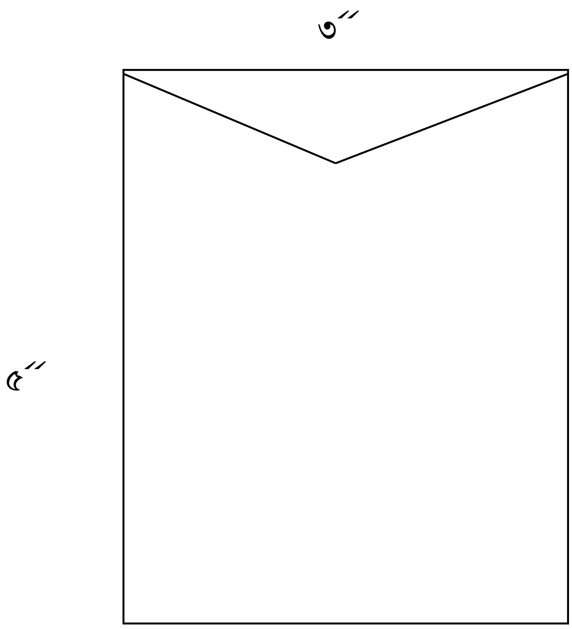

বুক পকেট

❒ বুক কার্ড: এটি বইয়ের বুক পকেটে ঢোকানো থাকে।

২″

ডাক সংখ্যা :
অ্যাকসেশন সংখ্যা :
লেখক :
শিরোনাম :

৪″

বুক কার্ড

❒ তারিখ পত্র: বই যখন ইস্যু করা হয়, তখন ইস্যু তারিখ ও ফেরতের তারিখ লিখে দেওয়া হয়।

৩″

লাইব্রেরির নাম:
ডাক সংখ্যা :
অ্যাকসেশন সংখ্যা :

৫″

ইস্যু তারিখ	ফেরতের তারিখ

তারিখ পত্র

২। গ্রাহকের জন্য প্রয়োজন হয় গ্রাহক কার্ড। গ্রাহককে যতগুলো বই ইস্যু করা হয়, ততগুলো গ্রাহক কার্ড গ্রাহককে দিতে হয়। এর উপরের দিক ও পাশের দিক খোলা থাকে।

২´´

৩´´

গ্রাহকের নাম :
ঠিকানা :
সদস্য নং :
মেয়াদ :

গ্রন্থাগারিকের স্বাক্ষর
সীল

গ্রাহক কার্ড

চার্জিং :

- গ্রাহক কাউন্টারে তার গ্রাহক কার্ড দেন।
- কাউন্টার কর্মী কাঙ্ক্ষিত বইটির পকেট থেকে বুক কার্ডটি বের করে গ্রাহক কার্ডের পকেটে গুঁজে দেন।
- তারিখপত্রে ইস্যু ডেট ও ডিউ ডেট এর ছাপ মারা হয়।
- বুককার্ড সম্বলিত গ্রাহক কার্ড চার্জিং ট্রেতে তারিখ নির্দেশক কার্ডের পিছনে সাজিয়ে রাখেন।

ডিসচার্জিং :

- বইটি ফেরত নেয়ার সময় কাউন্টার কর্মী ডিউ ডেট দেখে গ্রাহকের কার্ড বের করেন।
- গ্রাহকের কার্ড থেকে বুককার্ড বের করে বইটির বুক পকেটে গুঁজে রাখেন এবং গ্রাহক কার্ড ফেরত দেন।

বই ইস্যু রেজিস্টার পদ্ধতি :

ছোট লাইব্রেরিতে বই ইস্যু রেজিস্টার পদ্ধতি বই ইস্যুর জন্য যথেষ্ট। রেজিস্টারের প্রম দু-একটি পৃষ্ঠায় যে সকল ব্যবহারকারী বই ধার নেবে তাদের নামের ইনডেক্স তৈরি করে পৃষ্ঠা রেফারেন্স লিখে বই ইস্যু করতে হবে। এ নিয়মে একজন গ্রহীতার জন্য একটা পৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকবে।

বই ইস্যু পাতার নমুনা ছক

ইস্যু সংখ্যা	ইস্যু তারিখ	সংযোজন সংখ্যা	শিরোনাম	লেখক	গ্রাহকের স্বাক্ষর ও তারিখ	জমা নেওয়া কর্মীর স্বাক্ষর ও তারিখ	মন্তব্য
০১							
০২							
০৩							

গ্রন্থাগার ব্যবহার

গ্রন্থাগার ব্যবহার (Use of Library) :

পাঠ চাহিদা পূরণের জন্য লাইব্রেরি ব্যবহার অপরিহার্য। কিভাবে লাইব্রেরি ব্যবহার করতে হয় এর কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক কৌশল জানা থাকলে খুব সহজেই ব্যবহারকারী লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারেন। এগুলো না জানার কারণে ব্যবহারকারীদের কেউ কেউ বিব্রত বোধ করেন এবং লাইব্রেরি ব্যবহারে তাদের অনেক আগ্রহ কমে যায়। তাই ব্যবহারিক কৌশলগুলো ব্যবহারকারীদের শিক্ষাগ্রহণ অত্যাবশ্যক।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের নিয়মাবলিঃ

বিধি বা নিয়ম গ্রন্থাগারে সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা এবং কর্মক্ষেত্রে আনে মসৃণতা। তাই প্রতিটি গ্রন্থাগার সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য নিজস্ব নিয়মকানুন থাকা অত্যন্ত জরুরি। প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষই নিজ নিজ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান করার জন্য আইনত ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থাগারের বিধি বা নিয়ম এক রকম হয় না। যেমন- গণগ্রন্থাগারের বিধিসমূহ বিশেষ গ্রন্থাগারের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে কিছু নিয়ম আছে, যা সকল গ্রন্থাগারের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। জনহিতকর সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য যে নিয়ম বা বিধি অনুসরণ করা হয় তাকে গ্রন্থাগার বিধি-বিধান বা গ্রন্থাগারের নিয়মাবলি বলা হয়।

গ্রন্থাগারে আদর্শ বিধি-বিধান :

গ্রন্থাগারের ভিন্নতায় বিধি-বিধান ভিন্ন হয়ে থাকে। নিম্নের আদর্শ বিধি-বিধানের একটি নমুনা উল্লেখ করা হলো, যা সব ধরনের গ্রন্থাগারেই কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে অনুসরণ করা যেতে পারে।

১) গ্রন্থাগারের নাম : বিধি-বিধানে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখ করতে হবে।

২) সময়সূচি : গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সুবিধা এবং সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করণার্থে এলাকা, পাঠক, গ্রন্থাগার কর্মী, প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বিবেচনা করে সময়সূচি ঠিক করা উচিত। কলেজ ও স্কুল গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ক্লাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সময়সূচি করা যেতে পারে। সময়সূচি যাই হোক গ্রন্থাগার বন্ধ হওয়ার ৩০ মিনিট পূর্বেই লেনদেন সংক্রান্ত কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

৩) ছুটি : অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় গ্রন্থাগারেও সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে প্রচলিত সাপ্তাহিক ছুটির দিন না করে অন্য যে কোন দিন ছুটি ধার্য করতে পারে। সাপ্তাহিক ছুটির জন্য বিবেচনায় গ্রন্থাগারে যদি সাপ্তাহিক ছুটি না রাখা হয় তাহলে কর্মচারিদের রুটিনমাফিক ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নত বিশ্বে গ্রন্থাগার সার্ভিস অত্যাবশ্যকীয় হওয়ায় অনবরত খোলা রাখা হয়। এই নিয়ম অবশ্য স্কুল-কলেজ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না।

৪) প্রবেশাধিকার : গ্রন্থাগার সকল সদস্যেরই প্রবেশাধিকার স্বীকৃত। সদস্য ছাড়া কোন লোক গ্রন্থাগারে প্রবেশ করতে পারে না। তবে গ্রন্থাগারিক প্রয়োজনে যে কোন ব্যক্তিকে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারেন।

৫) বয়স : বয়স্কদের জন্য কোন বয়সসীমা নেই। শিশুদের জন্য এটি প্রযোজ্য। স্কুল গ্রন্থাগারের প্রধান শিক্ষক ঠিক করে দিবেন কত বছর পর্যন্ত বা কোন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগারে প্রবেশ করতে পারবে। উল্লেখ্য, স্কুল গ্রন্থাগারে সকল শ্রেণির ছাত্রছাত্রী গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারবে।

৬) ধার নেয়া সুবিধা

ক) সদস্য হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

খ) প্রত্যেক সদস্যকে সদস্যকার্ড বা গ্রাহককার্ড ইস্যু করতে হবে।

গ) বই ইস্যু করার সময় সদস্যকার্ড অবশ্যই কাউন্টারে দেখাতে হবে।

ঘ) সদস্যকার্ড হারিয়ে গেলে অনতিবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে এবং ডুপ্লিকেট কার্ড ইস্যু করার জন্য আবেদন জানাতে হবে। নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিলে কর্তৃপক্ষ ডুপ্লিকেট কার্ড ইস্যু করবেন।

ঙ) নির্দিষ্ট পরিমাণ বই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইস্যু করা হবে।

চ) নির্ধারিত সময়ে বই জমা না দিলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য নির্ধারিত হারে জরিমানা দিতে পাঠক বাধ্য থাকবেন।

ছ) ইস্যুকৃত বই সর্বোচ্চ এক/দুই বার রিনিউ করা হবে এবং রিনিউ করার সময় অবশ্যই কাউন্টারে জমা দিতে হবে।

জ) বই ক্ষতি সাধিত হলে নতুন বই µয় করে দিতে হবে বা বর্তমান বাজারমূল্যে দ্বিগুণ মূল্য পরিশোধ করতে পাঠক বাধ্য থাকবেন।

ঝ) রেফারেন্স ও দুষ্প্রাপ্য বই, পত্রিকা ও সাময়িকী ইস্যু করা হবে না।

ঞ) গ্রন্থাগারিক কোন কারণ না দেখিয়েই যে কোন বই ইস্যু বন্ধ করে দিতে পারেন বা ইস্যুকৃত বই ডিউ ডেট এর পূর্বেই সদস্যদের কাছ থেকে ফেরত চাইতে পারেন এবং এক্ষেত্রে সদস্যগণ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন।

৭) সাধারণ বিধি :

ক) গ্রন্থাগার কমিটি বা গ্রন্থাগারিক যে কোন ব্যক্তিকে কোন কারণ না দেখিয়েই গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে পারেন বা বিশেষ সুযোগ দিতে পারেন।

খ) প্রত্যেক পাঠক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাধ্য থাকবেন। তাদের আচরণ হবে ভদ্র ও সুন্দর।

৮) সদস্যকার্ড/গ্রাহককার্ড হস্তান্তরযোগ্য নয়।

৯) পোষা প্রাণী নিয়ে গ্রন্থাগারে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

১০) লাঠি, ছাতা, বক্স, ফাইল, ব্যক্তিগত বই বা অন্য যে কোন বস্তু গ্রন্থাগার বা পাঠ কক্ষের ভিতরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। কাউন্টারে জমা দিতে হবে।

১১) গ্রন্থাগারের ভিতরে ঘুমানো নিষিদ্ধ।

১২) গ্রন্থাগারের ভেতরে ধূমপানসহ অন্যান্য খাবার নিষিদ্ধ এবং নীরবতা পালন বাঞ্ছনীয়।

১৩) বই বা অন্য যে কোন সামগ্রীর কোন ধরনের ক্ষতি করা যাবে না। যদি কোন ধরনের ক্ষতি হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

গ্রন্থাগার বিধি-বিধান ব্যবহারকারীদের গ্রন্থাগারমুখী করা এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যবহারকারী ও গ্রন্থাগারকর্মীর সুযোগ-সুবিধা চিন্তা করেই বিধি-বিধান প্রণয়ন করা উচিত। একটি দেশ যেমন সংবিধান ছাড়া চলতে পারে না, ঠিক তদ্রুপ গ্রন্থাগারও তার নির্দিষ্ট বিধি-বিধান ছাড়া চলতে পরে না। এক দেশের সংবিধান যেমন অন্য দেশের ক্ষেত্রে অচল, ঠিক তেমনিভাবে এক গ্রন্থাগারের নিয়মাবলি অন্য গ্রন্থাগারে গ্রহণযোগ্য নয়।

লাইব্রেরি সামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance of Library Materials) :

প্রতিবছর নতুন নতুন বই কেনা হয়, সেইসঙ্গে কিছু কিছু পুরাতন বই অধিক ব্যবহারের কারণে অনুপযোগী হয়ে থাকে। যথা সময়ে সেইসব বই বাঁধাই করে না রাখলে ব্যবহারের অনুপযোগী বইয়ের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। শুধু বহুল ব্যবহারের কারণে বই ছেঁড়ে না, অসাবধানী ও আনাড়িপনাও বই নষ্ট হওয়ার কারণে হয়ে দাঁড়ায়। বইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পুরোপুরি গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বই ছিঁড়ে গেলে বাঁধাই করা, সামান্য ছিঁড়ে গেলে মেরামত করা কিংবা ছেঁড়ার পূর্বেই খেয়াল রাখা, কীভাবে বইটি হেফাজত করা যায়। আধুনিক যুগে বিশেষত বিজ্ঞান যেন মানুষকে উৎকর্ষ দান করেছে চিন্তার ক্ষেত্রেও তাই। সাধারণ মানের বইপত্র সংগ্রহের পর পর, অধিকাংশ গ্রন্থাগারই সেই সব বাঁধাই করিয়ে ফেলে। ফলে বইয়ের আয়ু স্বাভাবিকের চাইতে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বই ছেঁড়ার আগেই বইয়ের ব্যাপারে এই যে ভাবনা তা রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

১. বই খোলা : নতুন বই খোলার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। নতুন বইটি হাতে পেলে বইটি দুই হাত দিয়ে সমান করে ধরে স্পাইনের উপর ভর করে টেবিলে উপর রাখুন। তার ঠিক মাঝামাঝি অনুমান করে পাতাগুলো উভয়দিকে সমান দুইভাগ করুন। প্রথমে বাম দিক থেকে কিছু পাতা খুলে ডান দিকে নিন। এইভাবে সম্মুখ মলাট পর্যন্ত আসুন। ডানের পাতার জন্য একই নিয়ম মেনে চলুন। তবে নতুন বই সহজে বাঁধাই ছিঁড়বে না। কোন কোন সাবধানী ব্যবহারকারী দুই আঙ্গুলে বই ধরে মধ্য থেকে দুইভাগ কল্পনা করে নেয়। তারপরে ২/৪ পাতা করে একবার বামে ও একবার ডানে খুলে নেয়। এতে বইয়ের আয়ু বাড়ে। যারা নতুন বই ধরেই হঠাৎ করে খুলে ফেলে, আকস্মিকতার কারণে বই প্রথমে খোলার সময়ই ছিঁড়ে যায়।

২. পাতা কাটা : মাঝে মাঝেই পরিলক্ষিত হয় নতুন বই ও ম্যাগাজিনে কিছু অ-কাটা পাতা থাকে। এগুলো কাগজ কাটার ছুরি দিয়ে কেটে দিন। নতুবা ব্যবহারকারীগণ আঙ্গুল, কলম, পেন্সিলে কেটে পাতাগুলো নষ্ট করে ফেলবে।

৩. পাতা মুড়িবেন না : নতুন বই গ্রন্থাগারে আসার পরই একটি সিলমোহর লাগাবেন। প্রত্যেকটি বই ম্যাগাজিনের সামনের পাতাগুলোতে লেখা থাকবে পাতা মুড়িবেন না। এই সিলমোহর যেসব সচেতন পাঠক পড়বেন, আশা করা যায় তারা বইয়ের পাতা ভাঁজ করা থেকে বিরত থাকবেন। কোন কোন বইয়ের মধ্যে পত্র নির্দেশক আলগা ফিতাসহকারে ঝুলানো থাকে। পাঠক যে পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়া শেষ করেছে, সেখানে পত্র নির্দেশকটি রেখে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করে। এতে বই হেফাজত থাকে। আমাদের দেশে অল্প অল্প করে এই রেওয়াজ চালু হচ্ছে মাত্র।

৪. শেলফ থেকে বই বের করা: শেলফে রাখা বইসমূহ অনেকে বইয়ের উপরের অংশে আঙ্গুল দিয়ে টান দিয়ে বের করে আনে। এতে স্পাইন নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। শেলফ থেকে বের করে আনার সময় বইয়ের উভয় পার্শ্ব একটু খালি করে ন্যূনপক্ষে বইয়ের স্পাইনের মাঝামাঝি অংশ দুই আঙ্গুলে ধরে টান দিলে বই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

৫. ধুলোবালি: প্রতিনিয়তই বইয়ে ধূলাবালি জমে। নিয়মিত রুটিন কাজের অংশ হিসেবে বইয়ের ধূলাবালি পরিষ্কার করা আবশ্যক। তাহলে বইয়ের পাতা লাল হবে না, ময়লা হবে না এবং বই দীর্ঘায়ু লাভ করবে। যেসব বই ধূলোবালিমুক্ত থাকে সহসা সেসব বই পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

৬. আলো-বাতাস উত্তাপ: যে ঘরে গ্রন্থাগার, সেখানে স্বাভাবিক আলো-বাতাস উত্তাপের প্রবেশাধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। বেশি আলোতে বই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কম আলোতে গ্রন্থাগার আর্দ্রতাপূর্ণ হওয়ার কারণে স্যাঁতসেঁতে থাকে। তাই পরিবেশ দূষণের ফলে বই নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। প্রয়োজনীয় পরিমাণের চাইতে কম আলোতে গ্রন্থাগার পোকামাকড়, তেলাপোকা, ইঁদুর ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ আক্রমণের ভয় থাকে।

৭. আর্দ্রতা: গ্রন্থাগারের বুক শেলফ সর্বদা দেয়াল থেকে ন্যূনপক্ষে ১ ফুট দূরে এবং মাটি থেকে ৬ ইঞ্চি উচ্চে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। বাইরের ঠান্ডা এবং বৃষ্টি দেয়ালে প্রভাব ফেলে। বুক শেলফ দেয়ালের সঙ্গে লাগানো থাকলে দেয়ালের ঠান্ডা লেগে শেলফের বই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে পাতা নষ্ট হবে, মলাট খুলে যাবে, বই আর্দ্রতায় সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সুতরাং গ্রন্থাগারিককে এসব দিকে যথেষ্ট সচেতন হওয়া আবশ্যক।

৮. বুক সাপোর্ট *:* আধুনিক লাইব্রেরিগুলোতে বুক সাপোর্টের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বুক শেলফে পাশাপাশি অনেক বই আড়াআড়ি রাখা হলে একটি বইয়ের উপর অন্য বইয়ের চাপ পড়ে। অনুরূপ এক পর্যায়ে এক পাশের বইয়ের উপর অন্য পার্শ্বের সকল বইয়ের চাপ পড়তে থাকে। উল্লেখ্য, বুক শেলফে বই রাখার সময় বিন্যাসের সুবিধার্থে বইগুলো বাঁ দিকে কিঞ্চিত হেলান দিয়ে সাজানো হয়। ফলে ডানের সকল বইয়ের চাপ বাঁ দিকের বইয়ের উপর পড়ে। অথচ বইয়ের মাঝে মাঝে বুক সাপোর্ট ব্যবহার করলে বইপত্রের স্বচ্ছন্দ বিন্যাস ও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। বইকে চাপমুক্ত রাখাও সম্ভবপর হয়। ফলে বই নষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যায়। এছাড়া শেলফে বইকে খাড়া করে রাখার জন্য বুক সাপোর্ট অন্যতম সহায়ক।

৯. মেরামত : গ্রন্থাগারের বইপত্র অধিক ব্যবহারের কারণে কিছু কিছু বই সবসময়ই মলাট আগলা হয়ে যাবে। পাতা খুলে যাবে, ছিঁড়ে যাবে ইত্যাদি। গ্রন্থাগারে একটি বাঁধাই ও মেরামত বিভাগ থাকা আবশ্যক, যাতে অল্পবিস্তর নষ্ট হলেই বইটি সহসা মেরামত করা চলে।

১০. বইয়ের উপর চাপ দেয়া : লক্ষ্য করা যায় বেশ কিছু পাঠক পড়ার সময় দুই হাত বা কুনই দিয়ে বইয়ের উপর চাপ দেয়। অনেকে বইয়ের উপর মাথা রেখে বিশ্রাম নেয়, ঘুমায়, গুন গুনিয়ে গান গায়। এটা বদ অভ্যাস। এতে অনেক বই নষ্ট হয়।

সার্বিকভাবে বলা চলে গ্রন্থাগারকে আবর্জনামুক্ত রাখতে হবে। কীটপতঙ্গ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বই শেলফ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। বই, আসবাবপত্র ও মেঝে সর্বদা পরিষ্কার রাখতে হবে। গ্রন্থাগারের ভিতর পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শেলফে বই আড়াআড়ি রাখা যাবে না। ন্যাপথলিন ও কর্পূর বইয়ের আশপাশে ছড়িয়ে রাখলে কীটপতঙ্গের আক্রমণ কম হবে।

রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ। যে গ্রন্থাগারিক তার সংগ্রহের যত্নের প্রতি বিশেষ সাবধানী, তার গ্রন্থাগার সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে অগ্রগতির দিকে অগ্রসরমান থাকবে সেটা আশা করাই সংগত।

লাইব্রেরি সার্ভিসেস :

- রেফারেন্স সার্ভিস :

  লাইব্রেরিতে সংগৃহীত তথ্য সামগ্রীর উপর ভিত্তি করে তাৎক্ষণিকভাবে পাঠকের চাহিদা পূরণ করা হয়। এ সার্ভিসের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের অনুসন্ধানমূলক প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। যেমন : পাঠকের কাঙ্ক্ষিত বইটি আছে কিনা? এ সংবাদপত্রটি আছে কিনা? একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রবন্ধ আছে কিনা? এ ধরনের শব্দের ব্যবহার কোথায় পাওয়া যাবে ইত্যাদি নানা প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়। রেফারেন্স প্রদানের জন্য বইগুলো হলো যেমন– অভিধান, বিশ্বকোষ, ডায়েরি, বর্ষপঞ্জি, ম্যাপ, চার্ট, গ্লোব, এটলাস, গ্যাজেট, জীবনী কোষ, গেজেটিয়ার ইত্যাদি।

- গ্রন্থপঞ্জিগত সার্ভিস :

  বই সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বইয়ের নাম, লেখকের নাম, প্রকাশক, প্রকাশকাল ইত্যাদি উল্লেখসহ গঠিত তালিকা গ্রন্থপঞ্জি নামে পরিচিত। প্রয়োজনীয় বইটির সন্ধানে এটি ব্যবহার করা যায়। বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জি থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ের বইটি পাওয়ার জন্যও এটি ব্যবহার করা যায়।

- ডকুমেন্টেশন সার্ভিস :
  অতি সাম্প্রতিক প্রকাশিত প্রকাশনার তালিকা (CAS), নির্বাচিত তথ্যের তালিকা (SDI) বিতরণ করে এ সার্ভিস দেয়া হয়।

- কম্পিউটার সার্ভিস :
  দ্রুত কাঙ্ক্ষিত তথ্য খুঁজে পেতে এবং সংগ্রহ করতে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।

- রিপ্রোগ্রাফিক সার্ভিস :
  লাইব্রেরিতে প্রতিলিপি উৎপাদনের জন্য, তথ্য পুনরুৎপাদনের জন্য রিপ্রোগ্রাফিক সার্ভিস দেয়া হয়। আলোকচিত্রের মাধ্যমে কোন ডকুমেন্টের প্রতিলিপি উৎপাদন করে ব্যবহারকারীকে দেয়া হয়।

বই খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন Tools- এর ব্যবহার :

ক্যাটালগ:

লাইব্রেরিতে বইগুলোর পরিচিতি ক্যাটালগে দেয়া থাকে। বই খুঁজে পাওয়ার জন্য ব্যবহারকারীকে অবশ্যই ক্যাটালগের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে হয়। প্রত্যেকটি বইয়ের জন্য পৃকভাবে লেখকের নাম, বই শিরোনাম, বিষয় শিরোনাম ইত্যাদি লিখনে ক্যাটালগ কার্ড তৈরি করা হয়। এ কার্ডগুলো পৃকভাবে লেখকের নামে অথবা বই শিরোনামে অথবা বিষয় শিরোনামে বর্ণানুক্রমিকভাবে বা অ্যালফাবেটিক্যালি ক্যাটালগ ক্যাবিনেটে সাজানো থাকে। কার্ডগুলো থেকে কাঙ্ক্ষিত বইটির ডাকসংখ্যা সংগ্রহ করে বইটির খোঁজ করা যায়।

শেলফে বই বিন্যাস :

শেলফে বইগুলো শ্রেণিকরণ নম্বরের ক্রমানুসারে সাজানো থাকে। একই বিষয়ের ভিন্ন লেখকের বই সংখ্যানুসারে সাজানো থাকে। শেলফ থেকে ডাক সংখ্যার মাধ্যমে বই বের করতে হয়।

ইনডেক্স :

এতে প্রয়োজনীয় তথ্য কোথায় আছে তা জানা যায়। ইনডেক্স দেখে ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনীয় বই অতি সহজেই সংগ্রহ করতে পারে।

বই লেনদেন :

কাঙ্ক্ষিত বইটি হাতে পেয়ে লেনদেন কাউন্টারে গ্রাহক কার্ড জমা দিয়ে ইস্যু করিয়ে নিতে হয়। লেনদেনের নিয়মকানুন অনুসরণ করে বইটি নির্দিষ্ট সময়ের পর পুনঃ কাউন্টারে ফেরত দিতে হবে।

পাঠক উদ্বুদ্ধকরণ ঃ

লাইব্রেরিতে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, স্থানীয় জনগণ ও ব্যবহারকারীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকেন। এ ধরনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লাইব্রেরি ব্যবহারে আগ্রহ জেগে উঠে।

শিশুরা কোমলমতি, কোন কিছু তাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া মোটেই ঠিক হবে না। তাই শিশুদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটাই আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত হতে হবে। পাঠক উদ্বুদ্ধকরণের জন্য নিম্নেবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১। গ্রন্থাগারের অভ্যন্তর সজ্জিতকরণ:

শিশুদের জন্য গ্রন্থাগারটি অত্যন্ত সুসজ্জিত হতে হবে। যাতে করে অনেকটা খেলার ছলে শিশুরা গ্রন্থাগার ব্যবহার শিখতে পারে। যেমন-একটা শিশু গ্রন্থাগারে ঢুকেই যদি বড় সুন্দর ছবি দেখতে পায় আর সেই ছবিটি যদি তার প্রিয় ব্যক্তি হয় বা তার কোন এক প্রিয় খেলোয়াড়ের হয় তবে সেই ছবিটি ধরেই আমরা তাকে সেই প্রিয় ব্যক্তির দেশটি সম্পর্কে সুন্দরভাবে একটা ধারণা দিতে পারি। গ্রন্থাগারের বড় বড় ম্যাপ ও গ্লোব থাকতে হবে। শিশুদের পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের চার্ট বা ছবিগুলো গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা দরকার, যাতে করে শিশুদের জন্য তাদের পঠিত বিষয়গুলো সহজতর হয়।

২। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সামগ্রী প্রচার:

প্রচার হচ্ছে একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়া। গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার সংগ্রহের প্রচারের জন্য শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সম্মিলিত উদ্বোধনী ক্লাসে গ্রন্থাগারিক প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং এর সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করবেন। তাতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে এসেই জানতে পারবে যে, এখানে গ্রন্থাগার রয়েছে এবং পড়াশোনার সুযোগ আছে।

৩। লাইব্রেরি পিরিয়ড চালু করা:

ক্লাস রুটিনে অন্যান্য পিরিয়ডের সাথে গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য প্রতিদিন অথবা সপ্তাহের নির্দিষ্ট কোন দিন একটি পিরিয়ড রাখা হয়, তাই হলো লাইব্রেরি পিরিয়ড। লাইব্রেরি পিরিয়ডে শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরিতে বসে বই পড়বে। ক্লাস রুটিনে লাইব্রেরি পিরিয়ড সংযোজনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করবেন।

৪। অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন করা:

শিশুদের গ্রন্থাগারের দিকে কৌতূহল বাড়ানোর জন্য অভিভাবক সমাবেশের ভূমিকা অপরিসীম। বিদ্যালয়গুলোতে বৎসরে ১-২ বার অভিভাবক সমাবেশ করে তাদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে বোঝাতে হবে প্রয়োজনে অভিভাবকদের নিজ নিজ বই পড়ার উপর ভিত্তি করে পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৫। গ্রন্থমেলার আয়োজন করা:

বৎসরের অন্তত একবার গ্রন্থমেলার আয়োজন করতে হবে। বই এর স্টলগুলো খুব আকর্ষণীয় করতে হবে। শিশুরা যখন বিকাল বেলা বাবা-মার সংগে বই মেলায় আসবে, বই পড়ার প্রতি তাদের উৎসাহ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। জ্ঞান-অন্বেষণ করা ও নতুনকে জানার মধ্যেই তারা আনন্দ খুঁজে পাবে।

৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করা:

গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে ব্যাপক সাড়া জাগানো যায়। গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালনের জন্য সপ্তাহব্যাপী একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একজন স্থানীয় কবি, লেখক, বিচারক বা জেলা প্রশাসককে প্রধান অতিথি করে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করে সুন্দর করে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করা যায়। প্রতিদিন সকলের জন্য গ্রন্থাগার উন্মুক্ত রেখে সকলকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা যায়। শেষের দিন আরও একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাঠকদের পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখে গ্রন্থাগার সপ্তাহ শেষ করা যায়।

৭। নতুন বই সংগ্রহের সংবাদ প্রচার:

গ্রন্থাগারে সংযোজিত নতুন গ্রন্থের খবর গ্রন্থাগারিক ডিসপ্লে বোর্ডে বইয়ের জ্যাকেট প্রদর্শন করে পাঠকদের মাঝে প্রচার করবেন অথবা গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করে পাঠকদের মাঝে বিলি করবেন। এর ফলে পাঠকরা গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

৮। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা:

গ্রন্থাগারে সবগুলো বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে শিশুদের পড়ার প্রতি স্পৃহা বাড়বে। প্রতিযোগিতাটা অত্যন্ত তথ্যনির্ভর ও শিশুদের মজার মজার অনেক প্রশ্নের মধ্যে নিয়ে এসে প্রতিযোগিতাটাকে প্রাণবন্ত ও সজীব করে তোলা যায়। পুরস্কারের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে।

পাঠক উদ্বুদ্ধকরণ পাঠক বৃদ্ধির জন্য খুবই জরুরি। পাঠক বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধকরণের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ গুরুত্ব সহকারে পালন করা একান্তই আবশ্যক।

গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

তথ্য বিস্ফোরণের এ যুগে গ্রন্থাগারসমূহ জ্ঞান সংগ্রহ সংরক্ষণ ও বিতরণের এক নির্ভরযোগ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থাগারিক এ প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা। সভ্যতার বিনির্মাণে তাঁকে একজন কুশলী সংগঠকের মতোই স্বীয় দায়িত্ব পালন করতে হবে। জাতির মেধা বিকাশে এবং বুদ্ধিগত পরিপক্কতা অর্জনে তাঁকে সর্বদাই পালন করতে হবে সক্রিয় ভূমিকা। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মত তিনি একজন পেশাজীবী হলেও

তাঁর পেশা জ্ঞান জগতের সাথে জড়িত। এ জগতের উৎকর্ষ সাধনের মাঝেই সমগ্রজাতি বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। সে জন্য একজন গ্রন্থাগারিককে পেশাগত জীবনে বহুমুখী দায়িত্ব পালন করতে হয়। একজন আদর্শ গ্রন্থাগারিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে তাঁকে অবশ্যই নিম্নের দায়িত্বসমূহ পালন করতে হবে:

ক) পেশাগত দায়িত্ব: পেশাগত জীবনে একজন গ্রন্থাগারিক মূলত জ্ঞান বিতরণের কঠিন দায়িত্বে নিয়োজিত। জ্ঞানের সংগ্রহশালা গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক হয় জ্ঞান বিতরণের জন্য। সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য আবশ্যক হয় যথাযথ সংরক্ষণ ও বিতরণ। এ জন্য তাঁকে গ্রন্থাগারে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করতে হয় :

১. *গ্রন্থাগার সংগ্রহ গড়ে তোলা ও বৃদ্ধি করা:* পাঠকের জ্ঞানের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের ফলে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন আবিষ্কারের উদ্ভব ঘটছে। এমন একদিন ছিল যখন এদেশে কলের গান ছিল বিনোদনের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। আজ তার আর প্রচলন নেই। তার স্থান দখল করেছে রঙ্গিন টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি। জ্ঞান জগতের অবস্থাও অনেকটা অনুরূপ। নতুন নতুন মতবাদ প্রচারের সাথে সাথে পুরাতন তথ্য ও মতবাদটি অচল হয়ে যাচ্ছে। ফলে পরিবর্তন ঘটছে পাঠক সমাজের চাহিদার। গ্রন্থাগারিকের কাজ হলো পাঠকের চাহিদা ও রুচি মোতাবেক পাঠোপকরণ সরবরাহ করা। তিনি পাঠকের চাহিদা, প্রকাশনার গুণগতমান ও গ্রন্থাগারের আর্থিক সংগতি এ তিনের মাঝে সমন্বয় সাধন করে গ্রন্থাগার সংগ্রহ গড়ে তুলবেন।

২. *পাঠোপকরণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা:* গ্রন্থাগার সংগ্রহ বৃদ্ধির পাশাপাশি সংগৃহীত পাঠোপকরণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব। তিনি যেমন ডুবুরীর মতন কোনো সমুদ্র হতে মণিকাঞ্চন সংগ্রহ করে জ্ঞান ভান্ডার গড়ে তুলবেন ঠিক তেমনি যক্ষের মতো এসবের সংরক্ষণও করবেন। কারণ সংগ্রহের পাশাপাশি সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু থাকলেই সমৃদ্ধশালী সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। তাছাড়া এতে একদিকে যেমন অর্থের অপচয় রোধ হয় ঠিক তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মও বর্তমান প্রজন্মের ইতিহাস ও সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে।

৩. *বিন্যাসকরণ:* সংগৃহীত পাঠোপকরণের ব্যবহার ও গ্রন্থাগার সেবা নিশ্চিত করতে হলে পাঠোপকরণের বিন্যাস সাধন অত্যাবশ্যক। পাঠকের যাতে সময় নষ্ট না হয় এবং যে কোন সংগ্রহই প্রয়োজনমতো যাতে খুঁজে পাওয়া যায় সেজন্য গ্রন্থাগারের যাবতীয় সংগ্রহরাজি যথারীতি বিন্যস্ত করে সাজিয়ে রাখতে হয়। গ্রন্থাগারিকের এই গুরু দায়িত্ব পালনের মাঝেই বহুলাংশে নির্ভর করে গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধি। তাছাড়া শ্রেণিবিন্যাস গ্রন্থাগারিকতার ভিত্তি।

৪. *গ্রন্থাগারকে জীবন্ত রাখা:* সভ্যতার গতি অনুসারে গ্রন্থাগারের সংগ্রহবৃদ্ধির পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয়, ছেঁড়া বা পাঠের অনুপযোগী গুরুত্বহীন বইগুলো মাঝে মধ্যে ছাঁটাই করে নেয়ার মাধ্যমেই গ্রন্থাগারকে সময়োপযোগী রাখা যায়।

খ) প্রশাসনিক দায়িত্ব: গ্রন্থাগারিক পাঠক সমাজের মধ্যমণি হলেও তিনি প্রশাসনিক কাঠামোর আওতাধীন। গ্রন্থাগারের অধিকর্তা হিসেবে তাঁকেও কম বেশি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। ফলে একজন গ্রন্থাগারিককে সাফল্য অর্জন করতে হলে পেশাগত জ্ঞানের পাশাপাশি প্রশাসনিক জ্ঞানও অর্জন করতে হয়। তিনি গ্রন্থাগার পরিমন্ডলে যে সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন সেগুলো নিম্নরূপ:

১. *বাজেট প্রণয়ন:* পাঠকদের যথাযথ সেবাদান, গ্রন্থাগার সংগ্রহবৃদ্ধি ও সংরক্ষণ, গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় টুলসের যোগান ইত্যাদির জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তার বাজেট প্রণয়ন করে প্রত্যেক বৎসরই

কর্তৃপক্ষের নিকট মঞ্জুরীর জন্য পেশ করতে হয়, বড় গ্রন্থাগারগুলোতে এ বাজেট গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধান এবং ছোট গ্রন্থাগারগুলোতে গ্রন্থাগারিক নিজেই তা তৈরি করেন।

২. *খরচের হিসাব-নিকাশ:* গ্রন্থাগারের সকল কাজের জন্য গ্রন্থাগারিকই সর্বতোভাবে দায়ী। সে জন্য প্রতিটি কাজেই তাঁকে সতর্ক থাকতে হয়। সরকারি বা বেসরকারি যে কোন অর্থ-ব্যয়ের হিসাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহির জন্য গ্রন্থাগারের হিসাব-নিকাশ গ্রন্থাগারিককেই তদারক করতে হয়। ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলোতে গ্রন্থাগারিক নিজেই হিসাবপত্র তৈরি করে থাকেন।

৩. *প্রতিবেদন প্রণয়ন:* গ্রন্থাগার প্রশাসনের উত্তম নীতিগুলোর অন্যতম হলো মাসিক প্রতিবেদন করতে হয়। এ সকল প্রতিবেদন অধস্তন কর্মচারীদের সহায়তা নিয়ে গ্রন্থাগারিকই তৈরি করেন।

৪. *নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন:* অধস্তন কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ, তাদের কাজের তদারক ও সমন্বয় সাধন, তাদের কল্যাণমূলক কর্মকান্ড সম্পাদন প্রভৃতি দায়িত্ব গ্রন্থাগারিক পালন করে থাকেন।

গ) সেবামূলক বা মানবিক দায়িত্ব: গ্রন্থাগার একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। হাসপাতালগুলো যেমন রোগীদের নিয়ে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক তেমনি গ্রন্থাগারগুলো তার পাঠক সমাজকে নিয়ে ব্যস্ত। কাজেই একজন গ্রন্থাগারিককে পেশাগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই কিছু সেবামূলক বা মানবিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। এগুলো নিম্নরূপ:

১. *তাৎক্ষণিক সেবাদান:* পাঠকের চাহিদা মাফিক গ্রন্থাগারিককে যে কোন ধরনের তাৎক্ষণিক সেবাদানের প্রস্তুত থাকতে হয়। একজন পাঠক হয়তো গ্রন্থাগারে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গ্রন্থাগারিক কি তাঁকে গ্রন্থাগার থেকে বের করে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করবেন? তাঁকে অবশ্যই অসুস্থ পাঠকের সেবা ও চিকিৎসায় এগিয়ে আসতে হবে।

২. *সহযোগিতামূলক দায়িত্ব:* আধুনিক গ্রন্থাগারিকের সেবাকর্ম তাঁর চাকরি ক্ষেত্রের সীমিত পরিসরে আবদ্ধ নয়, ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনে তাঁকে বহুদূর এগিয়ে যেতে হয়ে। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী বা পাঠকদের অনেকেই জানেন না কোথায় কোন তথ্যটি পাওয়া যাবে অথচ তথ্যের খুব প্রয়োজন তাদের। এমতাবস্থায় গ্রন্থাগারিক ন্যূনপক্ষে উৎসের সন্ধান দেবেন তাঁর পাঠককে। এটাই গ্রন্থাগারিকের সেবাবৃত্তির দায়-দায়িত্ব, অপরিহার্য করণীয়।

৩. *পাঠকের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা:* বর্তমান কালে প্রতিটি পেশাজীবীই তাঁর মক্কেলদের সদা সচেতন রাখতে সচেষ্ট। কারণ মক্কেলদের চাহিদার উপরই পেশার প্রসার ও সাফল্য। গ্রন্থাগারের মক্কেল হলেন পাঠক সমাজ। পাঠকদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি ও পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য গ্রন্থাগারিককে অবশ্যই সচেষ্ট থাকতে হয়। পাঠকদের উৎসাহী করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রদর্শনী, প্রচারপত্র বিতরণ, বিভিন্ন প্রকাশনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি এ দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

গ্রন্থাগার মানবকল্যাণে নিবেদিত একটি মহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের বহুলাংশে নির্ভর করে গ্রন্থাগারিকের সচেতনতা ও দায়িত্ব পালনের মধ্যে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে তাঁর এ দায়িত্বের গন্ডি ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করছে। ফলে গ্রন্থাগারিকগণ জ্ঞানতরীর নির্ভরযোগ্য কান্ডারী হিসেবে আত্ম প্রকাশ করছেন, যা জাতির জন্য নিঃসন্দেহে শুভ লক্ষণ।

পরিশেষে বলতে হয়, গ্রন্থাগারিক বেঁচে থাকবেন তাঁর কাজের মাধ্যমে, যোগ্যতা প্রদর্শনের মাধ্যমে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব পালনের, সদাচরণ ও নিষ্ঠাবান নেতৃত্বের অগ্রদূত হওয়ার মাধ্যমে এবং

সমাজকে সু এবং স্ব-শিক্ষা দানে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে। গ্রন্থাগারিক একজন কর্মী। গ্রন্থাগারিক একজন নেতা, গ্রন্থাগারিক একজন মানুষ। একজন মানুষের পক্ষে অপর মানুষের জন্য যা করণীয় সেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই তিনি সকলের মধ্যমণি হয়ে থাকবেন, থাকতে সচেষ্ট হবেন এটাই হবে তাঁর ধ্যান ও ধারণা। তা হলেই তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন বলে উপলব্ধি হবে, তিনি হবেন গ্রন্থাগারিক।

সমস্যা :

- রেফারেন্স সার্ভিস সহায়ক ১০টি বইয়ের নাম লিখুন।
- গ্রন্থপঞ্জিগত তথ্য নিয়ে ১০টি বইয়ের একটি গ্রন্ধপঞ্জি তৈরি করুন।

গ্রন্থপুঞ্জি :

লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট (২০০০), প্রশিক্ষণ মড্যুল। ঢাকা: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
শাহজাহান, এস.এম (২০০৭), গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পরিচয় । ঢাকা: প্রভাতি লাইব্রেরি।
আহাম্মদ, এডিএম আলী (১৯৯৯), গ্রন্থাগার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা। ময়মনসিংহ: আজিজ প্রিন্টার্স।
আলী, মোহাম্মদ সা'দত (১৯৯৩), আধুনিক গ্রন্থাগার রেফারেন্স সার্ভিস। ঢাকা: এশিয়া বুক হাউস।
আলী, মোহাম্মদ সা'দত (১৯৮২), আধুনিক ক্যাটালগ ও বিষয় শিরোনাম। ঢাকা: বুকস এন্ড সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল।
আলী, মোহাম্মদ সা'দত (১৯৯৬), স্কুল-কলেজের গ্রন্থাগার পরিচালনা। ঢাকা: প্যারাগন পাবলিশার্স।
Wahiduzzaman (1996), M. Approach To Library Administration. Dhaka: Croue Books.
ভূঁইয়া. সাখাওয়াত হোসেন (২০০৩), গ্রন্থাগার বিজ্ঞান। ঢাকা: প্রভাতি লাইব্রেরি এন্ড পাবলিকেশন্স।
গুপ্ত, সুশীল কুমার (১৯৮৯), গ্রন্থাগার প্রশাসন। কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
আলী, মোহাম্মদ সা'দত (২০০৩), আধুনিক ক্যাটালগিং। ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ।
আলী, মোহাম্মদ সা'দত (১৯৯৩), আধুনিক গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান। ঢাকা: পল্লব পাবলিশার্স।
আলী, মোহাম্মদ সা'দত (২০০৬), শিক্ষা ও উন্নয়নে গ্রন্থাগার। ঢাকা: নতুন ধারা।
আলী, মোহাম্মদ সা'দত (২০০৩), আধুনিক ক্যাটালগিং: তত্ত্ব ও অনুশীলন। ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ।
রহমান, মো: মিজানুর (২০০৩), ব্যবহারিক শ্রেণিকরণ। ঢাকা: নিউ প্রগতি প্রকাশনী।
রহমান, মো: মিজানুর (২০০৪), গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান পরিচিতি-১। ঢাকা: নিউ প্রগতি প্রকাশনী।
রহমান, মো: মিজানুর (২০১৫), গ্রন্থাগারে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ । ঢাকা: নিউ প্রগতি প্রকাশনী।
হক, কাজী মোস্তাক গাউসুল (২০১১), তথ্য প্রতিষ্ঠানের স্বয়ংক্রিয়করণ। ঢাকা: নলেজ রেইন।
আজিজ, আ: আব্দুল (২০১৩), তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা। ঢাকা: ফ্রেন্ডস বুক কর্ণার।

ডিজিটাল লাইব্রেরি ও ওয়েব রিসোর্স
Digital Library & Web Resource

ডিজিটাল লাইব্রেরিঃ

সাম্প্রতিক সময়ে ডিজিটাল লাইব্রেরির ধারণাটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 'ডিজিটাল লাইব্রেরি' শব্দগুচ্ছের উৎস সন্ধান করতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে আজ থেকে প্রায় দুই যুগ আগে। সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন, দি অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি এবং ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স এন্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মিলে ডিজিটাল লাইব্রেরিজ ইনিশিয়েটিভ নামে একটি প্রকল্পে অর্থায়ন করে। ১৯৯৪ সালে এ প্রতিষ্ঠানগুলো মিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়কে ডিজিটাল লাইব্রেরি গবেষণার জন্য ২৪.৪ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেয়। খুব দ্রুতই কম্পিউটার বিজ্ঞানী, তথ্য পেশাজীবী এবং অন্যরা 'ডিজিটাল লাইব্রেরি' শব্দযুগলকে লুফে নেয়। সে থেকে নানা নামে নানারূপে আমরা গোটা বিশ্বজুড়ে নানা রকমের ডিজিটাল লাইব্রেরি উদ্যোগ প্রত্যক্ষ করছি।

সাধারণভাবে ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক লাইব্রেরি বলতে আমরা এমন একটি গ্রন্থাগারকে বুঝি যেখানে তথ্যসম্পদের একটি বড় অংশ যন্ত্রের মাধ্যমে পাঠযোগ্য একটি আকৃতিতে থাকে এবং কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসব তথ্যসামগ্রীতে প্রবেশ করা যায়। ডিজিটাল লাইব্রেরিকে স্থানীয়ভাবে যেমন সংরক্ষণ করা যায় তেমনি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দূরবর্তী অবস্থান থেকেও এটিকে ব্যবহার করা যায়। গ্রন্থাগারে ডিজিটাইজেশন শুরু হয় ক্যাটালগ সিস্টেমের ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে, এরপর সাময়িকীর নির্ঘন্ট এবং সারসংক্ষেপকরণ সেবা, তারপর সাময়িকী এবং রেফারেন্স গ্রন্থসমূহ এবং সব শেষে বই পুস্তক ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে এই প্রক্রিয় শেষ হয়। ডিজিটাল লাইব্রেরিকে ডিস্কটপ লাইব্রেরি, দেয়ালবিহীন গ্রন্থাগার, নেটওয়ার্কড লাইব্রেরি ইত্যাদি অভিধায়ও অভিহিত করা হয়।

ডিজিটাল লাইব্রেরির পরিধি বেশ ব্যাপক, এ কারণে অনেকে গ্রন্থাগারকেই মাঝে মাঝে ডিজিটাল লাইব্রেরি নামে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। এর মধ্যে এক ধরনের গ্রন্থাগার আছে যেগুলোকে বলা হয় হাইব্রিড গ্রন্থাগার, এখানে ডিজিটাল এবং প্রিন্ট উভয় ধরনের সামগ্রীই থাকে। এছাড়াও আছে এমন গ্রন্থাগার যেখানে সংগ্রহ প্রায় শতভাগই ডিজিটাল। এর মধ্যে আছে প্রজেক্ট গুটেনবার্গ, আইবিবলিও, ইন্টারনেট আর্কাইভ ইত্যাদি।

গ্রন্থাগার পরিচালনার দিক দিয়ে প্রথাগত গ্রন্থাগার ও ডিজিটাল লাইব্রেরি মধ্যে অমিলের পাশাপাশি অনেক মিলও আছে। একটি ডিজিটাল লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগার সামগ্রী সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সার্কুলেশন, সিরিয়াল নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কর্মকান্ড কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ব্যবহারের মাধ্যমে সংগ্রহ হয়ে থাকে, যদিও মূলত ইলেকট্রনিক সামগ্রী নিয়েই গ্রন্থাগারের সংগ্রহ গড়ে ওঠার কারণে সামগ্রী সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিতরণের পুরো কর্মকান্ডের চরিত্রই আলাদা। একটি ডিজিটাল লাইব্রেরির তথ্য পুনরুদ্ধার কর্মকান্ডের মধ্যে আছে ডকুমেন্ট-ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, অনলাইন অনুসন্ধান সেবা, ইন্টারনেট এবং সিডি-রম অনুসন্ধান। বিশেষায়িত তথ্য পুনরুদ্ধার সেবার মধ্যে আছে চলতি তথ্য জ্ঞাপন সেবা এবং ইনডেক্সিং। ইন্টারনেট এ ধরনের গ্রন্থাগার সামগ্রীতে প্রবেশ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অগ্রসর সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী বিভিন্ন অনুসন্ধান কৌশল ব্যবহার করে নিজের প্রয়োজনমত তথ্য সামগ্রী পুনরুদ্ধার করতে পারেন। ইন্টারনেট বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যে সমস্ত ডাটাবেসে অ্যাকসেস নেয়া সম্ভব নয় সেগুলো সিডি-রমকে পারস্পারিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন আলাদা আলাদা লোকেশনে ব্যবহার করা যায়। সিডি-রমের সংগে থাকে বিশেষায়িত অনুসন্ধান সফটওয়্যার যাতে করে এর বৃহৎ ডাটাবেসে কার্যকর অনুসন্ধান সম্ভব হয়।

ডিজিটাল লাইব্রেরির সুবিধা

প্রথাগত গ্রন্থাগারসমূহ স্থান সংকুলানের সমস্যা ভুগে থাকে, কিন্তু ডিজিটাল গ্রন্থাগার এদিক থেকে সীমাবদ্ধতামুক্ত, কারণ এখানে অল্প জায়গায় বিপুল পরিমাণ সামগ্রী সংরক্ষণ করা সম্ভব। এছাড়া ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে দ্রুত ধারণ করতে পারে এবং ইলেকট্রনিক ও অডিও বইসহ নানা তথ্য মাধ্যমের ব্যাপক কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সামগ্রী ব্যবহারের সীমাকে বহুদূর প্রসারিত করে দেয়। একটি ডিজিটাল লাইব্রেরির সুবিধাসমূহের মধ্যে আছে ঃ

১) **ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতামুক্ত ঃ** ডিজিটাল লাইব্রেরি ব্যবহারকারীর গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বেরহওয়ারই দরকার হয় না। তিনি বাড়িতে বসেই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধা নিয়ে সারাবিশ্বের এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকও গ্রন্থাগারের সুবিধাভোগী হতে পারে।

২) **সময়ের সীমাবদ্ধতামুক্ত ঃ** ডিজিটাল লাইব্রেরির একটি বড় সুবিধা হচ্ছে, এটি সময়ের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত এবং ২৪ ঘন্টাই এর সেবা পাওয়া সম্ভব। রাতদিন যে কোনো সময় যে কেউ এ গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে।

৩) **একাধিক ব্যক্তির একই সামগ্রী ব্যবহার ঃ** একই তথ্য সামগ্রী একের অধিক ব্যক্তি যুগপৎ ব্যবহার করতে পারেন, ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং কে কোন ভৌগলিক অবস্থানে থেকে ঐ সামগ্রী ব্যবহার করছেন সেটি খুব বড় কোনো ব্যাপার নয়।

৪) **পদ্ধতিগত ও কাঠামোভিত্তিক ব্যবহার ঃ** ডিজিটাল লাইব্রেরিতে বিপুল পরিমাণে তথ্যসম্পদে অত্যন্ত কাঠামোভিত্তিক ও পদ্ধতিগতভাবে প্রবেশ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা একটি অনলাইন ক্যাটালগ থেকে একটি বই এবং তারপর ঐ বইয়ের একটি অধ্যায়ের পদ্ধতিগতভাবে প্রবেশ করতে পারি।

৫) **তথ্য পুনরুদ্ধার ঃ** ডিজিটাল সামগ্রীতে অনুসন্ধান ও তথ্য পুনরুদ্ধার খুবই সহজ এবং কার্যকর। তথ্য অনুসন্ধানে অগ্রসর পর্যায়ের দক্ষতা না থাকলেও একজন সাধারণ ব্যবহারকারী সম্পূর্ণ গ্রন্থাগর সংগ্রহ থেকে সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধান শব্দ দিয়ে অনুসন্ধান পরিচালনা করতে পারেন। এছাড়া ডিজিটাল লাইব্রেরিতে আছে ব্যবহারকারী বান্ধব ইউজার ইন্টারফেস এবং মাউস ও কিবোর্ডের মত সাধারণ ইনপুট ডিভাইস, যেগুলো ব্যবহার করে আমরা সহজেই তথ্য ভান্ডারে প্রবেশ করতে পারি।

৬) **সংরক্ষণ ও ব্যবহার নমনীয়তা ঃ** ডিজিটাল সামগ্রীর সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ তুলনামূলক সহজ। এছাড়া ব্যবহারে নমনীয়তার কারণে একটি মূল ডকুমেন্টের মানের কোনো হানি না করেই এটিকে অসংখ্যবার পুনরুৎপাদন করা যায়।

৭) **স্থানাভাব নেই ঃ** প্রথাগত গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার সংগ্রহ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে স্থানাভাব প্রায়শই একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ডিজিটাল লাইব্রেরি এ সমস্যা থেকে মুক্ত, কারণ এখানে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে বিপুল পরিমাণে তথ্য সম্পদ সংরক্ষণ করা যায়।

৮) **নেটওয়ার্কিং ঃ** একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি অন্যান্য ডিজিটাল লাইব্রেরির বিশাল তথ্যসম্পদে প্রবেশেরও উপায় করে দেয়। এর ফলে এক ধরণের বাধাহীন সমন্বিত রিসোর্স শেয়ারিং নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং এর সেবা গ্রহণ করা যায়।

৯) **স্বল্প ব্যয় ঃ** যদিও ব্যয়ের ব্যাপারে ডিজিটাল লাইব্রেরির ভালমন্দ দুটো দিকই আছে, তারপরও তত্ত্বগতভাবে প্রথাগত গ্রন্থাগারের চাইতে এটি রক্ষণাবেক্ষণে খরচ কম। বিশেষ করে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, মুদ্রিত সামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ, বাড়ি ভাড়া ইত্যাদির পেছনে একটি প্রথাগত গ্রন্থাগারে বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হয় যেটি ডিজিটাল লাইব্রেরিতে হয় না।

ডিজিটাল লাইব্রেরির অসুবিধা ঃ

বিভিন্ন সময় ডিজিটাল লাইব্রেরির বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কথা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে; মূলত এসব সীমাবদ্ধতার কারণেই ডিজিটাল লাইব্রেরির বাস্তবায়ন এখনও কাম্য মাত্রায় করা সম্ভব হচ্ছে না। ডিজিটাল লাইব্রেরির অসুবিধার মধ্যে আছে ঃ

১. **উচ্চ ব্যয় ঃ** তত্ত্বগতভাবে ডিজিটাল লাইব্রেরি ব্যয় সাশ্রয়ী হলেও মুদ্রিত সামগ্রীকে ডিজিটাল সামগ্রীতে রূপান্তরের পেছনে বিপুল পরিমান অর্থব্যয়ের প্রয়োজন পড়তে পারে। এছাড়া এসব সামগ্রীর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, অনলাইন অ্যাকসেস, নেটওয়ার্কিং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ইত্যাদির পেছনে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেত হয়। প্রযুক্তির অব্যাহত অগ্রগতির কারণে নির্দিষ্ট সময় পর পর ডিজিটাল লাইব্রেরিকে সাম্প্রতিক ডিজিটাল মিডিয়ায়ও স্থানান্তর বা মাইগ্রেট করতে হতে পারে, ফলে খরচের মাত্রাও বেড়ে যাবে।

২. **কপিরাইট সমস্যা ঃ** ডিজিটাল লাইব্রেরির সামগ্রীর কপিরাইট ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বত্ব নিয়ে বিভিন্ন সময়ই নানান বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। কপিরাইট বহির্ভুত সামগ্রী ডিজিটাইজেশন করার মাধ্যমে এ সমস্যাকে

এড়ানোর চেষ্টা করা হলেও কপিরাইটেড সামগ্রীর ডিজিটাইজেশন নিয়ে প্রায়ই নানারকম আইনী ঝামেলার সূত্রপাত হচ্ছে।

৩. **ডিজিটাল বৈষম্য ঃ** সারা বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নতি একই মাত্রায় ঘটেনি। কোনো কোনো দেশ বিদ্যুৎ, কম্পিউটারায়ন, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে এগিয়ে গেলেও বেশির ভাগ দেশই এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। কাজেই নীতিগতভাবে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সবাই ডিজিটাল লাইব্রেরির সুবিধাভোগী হবার কথা থাকলেও বাস্তবে তা মোটেই সম্ভব হচ্ছে না আর এ কারণে ডিজিটাল বৈষম্যের শিকার দেশগুলো ডিজিটাল লাইব্রেরির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ডিজিটাল লাইব্রেরি ও প্রচলিত লাইব্রেরির মধ্যে পার্থক্য ঃ

প্রচলিত গ্রন্থাগার		ডিজিটাল গ্রন্থাগার	
১।	সাধারণ মুদ্রিত উপকরণ সংগ্রহ করা হয়।	১।	সকল উপকরণ ডিজিটাল ফরমেটে হয়ে থাকে।
২।	প্রচলিত গ্রন্থাগার স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এর পরিবর্তন খুবই ধীর গতির।	২।	ডিজিটাল গ্রন্থাগার দ্রুত পরিবর্তনশীল। এটা ক্ষণস্থায়ী।
৩।	প্রতিটি উপকরণ অন্যান্য উপকরণের সাথে সরাসরি সংযুক্ত নয়।	৩।	ডিজিটাল গ্রন্থাগারে উপকরণসমূহ মাল্টিমিডিয়া এবং ভগ্নাংশ উপকরণ।
৪।	প্রচলিত গ্রন্থাগারের অ্যাকসেস পয়েন্ট সীমাবদ্ধ এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়।	৪।	ডিজিটাল গ্রন্থাগারে সংযোগকৃত পয়েন্ট হতে অ্যাকসেস করতে পারে।
৫।	প্রচলিত গ্রন্থাগারের উপকরণসমূহ শারীরিকভাবে দৃশ্যমান।	৫।	ডিজিটাল গ্রন্থাগার উপকরণসমূহ ভার্চুয়াল।
৬।	প্রচলিত গ্রন্থাগারের উপকরণসমূহ মুক্ত নয় এবং সর্বত্র ব্যবহার করা সম্ভব নয়।	৬।	ডিজিটাল গ্রন্থাগারের উপকরণসমূহ মুক্ত এবং সর্বত্র ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

ওয়েব বেইজড লাইব্রেরি সার্ভিস ঃ

WWW (World Wide Web) ও Information Storage and delivery tools হিসেবে গড়ে ওঠার কারণে দ্রুততার সাথে ও স্বল্পব্যয়ে তথ্য আদান-প্রদান ও ভবিষ্যত ব্যবহারে এক অসম্ভব গতিসম্পন্ন মাধ্যমে হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। গ্রন্থাগারে তথ্য অনুসন্ধান, তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ইন্টারনেট ব্যাপক পরিবর্তন করে দিয়েছে। যত বেশি গ্রন্থাগারে তথ্য সেবা ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রদানে করা হবে তথ্য ব্যবহারকারীরা তত বেশি ভ্রাম্যমান অঞ্চল থেকে ইলেকট্রনিক তথ্যের উৎস হতে ব্যবহার করতে পারবে।

প্রযুক্তিগত প্রভূত উন্নতি ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির কারণে লাইব্রেরির উপর তার ব্যবহারকারী সম্প্রদায়কে সেবা প্রদানে আরো বেশি আকর্ষণীয় করার দায়িত্ব বর্তেছে। প্রযুক্তির উন্নতির ছোঁয়া শুধুমাত্র তথ্যের উৎস ও তথ্যের রূপকে নাড়া দেয়া নয়, বরঞ্চ কোথায় এবং কীভাবে তথ্য সেবা প্রদান করা হবে তাতেও প্রভাব ফেলেছে।

লাইব্রেরির রিসোর্সগুলো আজকে ইন্টারনেটের ভার্চুয়াল যুগকে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ইন্টারনেটের বদৌলতে আজকে যেকোন ব্যবহারকারী বিশ্বের যে কোন স্থান হতে গ্রন্থাগারের রিসোর্স ব্যবহার করে তার চাহিদা পূরণ করতে পারছে।

সহজ কথায় বলা যায়, ওয়েব রিসোর্স হিসেবে গড়ে ওঠে যে গ্রন্থাগার সেবা প্রদান করা হয় তার সমষ্টিগত রূপকেই ওয়েবসাইট লাইব্রেরি সার্ভিস বলা হয়।

ওয়েব বেইস লাইব্রেরি সেবার প্রয়োজনীতা ঃ

ইন্টারনেটের মাধ্যমে লাইব্রেরি সেবা দিতে হলে প্রচলিত সেবার ক্ষেত্রের মতো কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্নিবেশ করতে হবে, যেমন-Accuracy, Promptness এবং তথ্য চাহিদার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে সক্ষমতা। ইন্টারনেটের মাধ্যমে লাইব্রেরি সার্ভিস প্রদানে গ্রাহক ও তার সুবিধামত সময়ে ইনফরমেশন রিসোর্স-এ ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান করা হয়। এতে করে যাতায়াতের সময় ও খরচ বাঁচে। এটা গতানুগতিক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয় বরং সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টাই ব্যবহার উপযোগী থাকে।

ওয়েব বেইজড লাইব্রেরি সেবা প্রদানের বিভিন্ন মাধ্যম ঃ

আজকের দিনে ব্যবহারকারীদের বহুধরনের Texual Information Resource -এ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন তথ্যে অনুপ্রবেশের জন্য নানা ধরনের ওয়েব বেইস রেফারেন্স রিসোর্স এবং সার্ভিস রয়েছে। সেগুলো হলো- OPAC, Gateways, Subject Portals, Electronic Journal, Online Database, Search Engine এবং Subject Directories.

১. **OPAC ঃ** Online Public Access Catalogue যা ব্যবহারকারীকে একটি নির্দিষ্ট লাইব্রেরির নিজস্ব ভান্ডারের সংগৃহীত রিসোর্সের গ্রন্থপঞ্জিগত তথ্য সরবরাহ করে।

২. **Gateways ঃ** একটি নির্দিষ্ট সাবজেক্ট এরিয়াতে ডেটাবেজ নেটওয়ার্ক বেইস রিসোর্স সহজে ব্যবহার করা যায়। এটা যে কেউকে রিসোর্স ডেটাবেজ এবং ইনডেক্স-এ সাধারণ অনুসন্ধান এবং বর্ধিত অনুসন্ধানের সুবিধা প্রদান করে । যেমন- Internet Public Library, Bulletin Board for Library.

৩. **Subject Portals ঃ** লাইব্রেরি কমিউনিটির মতে, লাইব্রেরি কর্মীদের দেয়া বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমের সংমিশ্রণকে পোর্টাল বলে। এই সংমিশ্রণ হবে বিদ্যমান সেবাসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে একীভূতকরণের কাজের মাধ্যমে। প্রাথমিকভাবে যদিও কম্পিউটার বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক ওয়েব সার্চ টেকনোলজির উন্নতি সাধিত হয়েছিল কিন্তু ধীরে ধীরে তথ্য বিশারদগণ ইন্টারনেট তথ্যসম্পদ-ভান্ডার সমৃদ্ধকরণে তাদের স্বকীয়তার স্বাক্ষর

রয়েছে। তথ্য পেশাজীবী কর্তৃক উন্নয়নকৃত বিষয় পোর্টাল হলো- SOSIG (Social Science Information Gateway)।

৪. **Electronic Journal** ঃ ওয়েব বেইস গ্রন্থাগার সেবা প্রদানের একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ইলেকট্রনিক জার্নাল। আজকের দিনে বহু জার্নাল ই-জার্নাল ভার্সনে প্রকাশিত হচ্ছে। এদের কিছু সম্পূর্ণ টেক্সট এবং কিছু সারসংক্ষেপসহ গ্রন্থপঞ্জিগত তথ্যসেবা প্রদান করছে। এটার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো তাৎক্ষনিকভাবে Upgrade হয়। কিন্তু অসুবিধা হলো এতে কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন হয়।

৫. **Online Database** ঃ এটা হলো মেশিন রিডেবল ফরমেটে থাকা ডেটা এর বিশাল সংগ্রহ যা ব্যবসায়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত এবং কমিউনিকেশন লাইনের মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়। এ ধরনের ডেটাবেজের জন্য চাঁদা দিতে হয় এবং নতুন নতুন তথ্য ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এতে শুধু গ্রন্থপঞ্জিগত তথ্য পাওয়া যায়।

৬. **Search Engine** ঃ সার্চ ইঞ্জিন হলো মেশিনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সন্নিবেশিত ওয়েব পেইজ ফাইলে বিশাল ডেটাবেজ। সার্চ ইঞ্জিন প্রত্যেকটি ওয়েব সাইট ও সাবজেক্ট ডিরেক্টরি-এর হোমপেইজ-এর ইনডেক্স তৈরি করে। সার্চ ইঞ্জিন ইতোমধ্যে তথ্য পুনরুদ্ধার সিস্টেম হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মূলত সার্চ ইঞ্জিন হলো একটি সফটওয়্যার যা ব্যবহারকারীদের অনুসন্ধান ও তার উত্তর মিল করে প্রদর্শন করে।

৭. **Subject Directories** ঃ সাবজেক্ট ডিরেক্টরী হলো সার্চ ইঞ্জিন থেকে আলাদা একটি ডেটাবেজ কালেকশন। যেখানে সার্চ ইঞ্জিন মেশিনের মাধ্যমে ডেটাবেজ তৈরি করে, সেখানে সাবজেক্ট ডিরেক্টরী মানুষের তৈরি বিন্যস্ত ডেটাবেজ ব্যবহার করে। সাবজেক্ট ডিরেক্টরী মূলত বিভিন্ন ওয়েব সাইটের হোমপেজ ইনডেক্স তৈরি করে। সাধারণ, একাডেমিক, বানিজ্যিক অথবা পোর্টাল চাহিদামত এদের শ্রেণিবদ্ধ করা হয়।

নতুন ওয়েব ভিত্তিক গ্রন্থাগার সার্ভিস ঃ

১. **Virtual Library Tour** ঃ লাইব্রেরিগুলোর ওয়েবসাইট লাইব্রেরির সুযোগ সুবিধার তথ্যবিবরণী। এত থাকে লাইব্রেরির সংগ্রহ, সেবা, নির্দেশনা ইত্যাদি।

২. **Ask a Librarian** ঃ Ask a Librarian হচ্ছে একটি ইন্টারনেট ভিত্তিক প্রশ্ন-উত্তর সেবা, যাতে প্রত্যেক ব্যবহারকারী এমন এক তথ্য পেশাজীবীর সাথে মত বিনিময় করে নিতে পারে যিনি কোনো বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সহজে এ সেবা দিতে সক্ষম। অধিকাংশ Ask a Librarian সেবা হচ্ছে ওয়েব ভিত্তিক। এখানে ওয়েব পেইজ বা ই-মেইলের মাধ্যমে প্রশ্ন করা দেওয়া এবং উত্তর দেয়া যায়। এখানে ব্যবহারকারীকে ওয়েব ফরম বা ই-মেইলের মাধ্যমে প্রশ্ন জমা দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সিস্টেম কর্তৃক একবার

পঠিত হওয়ার পর তা ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞের কাজে স্থানান্তরিত হয়। তারপরে ঐ বিশেষজ্ঞের পক্ষে বিস্তারিত তথ্য বা তথ্যের উৎসের তালিকা সরবরাহ করা হয়।

৩. **Real Time Service ঃ** ডিজিটাল রেফারেন্স সার্ভিসের একটি নতুন মজাদার সার্ভিস হলো Real Time Service। এর মাধ্যমে লাইব্রেরিগুলো ব্যবহারকারীদের অধিক নতুন রেফারেন্স তথ্য প্রদানে সচেষ্ট থাকে। Real Time Service এর সরাসরি সিস্টেমের সাথে সংযোগ স্থাপন করে রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ানদের সাথে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান হতে যোগাযোগ করতে পারে।

৪. **Bulletin Board ঃ** বুলেটেন বোর্ড হচ্ছে ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন ফরম। যেটা একটি নির্দিষ্ট সাবজেক্ট-এর উপর যত ধরনের ম্যাসেজ ও আর্টিক্যাল প্রকাশিত হয় সবগুলোকে একসাথে করে। এতে ব্যবহারকারীকে ম্যাসেজের মাধ্যমে জানান দেয়া হয় এবং তথ্য পুনরুদ্ধার সুযোগ প্রদান করা হয়।

৫. **World Cat ঃ** World Cat হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি Context এবং সেবার নেটওয়ার্ক। World Cat তাদের ওয়েব সাইটে থাকা রিসোর্স ব্যবহারে উদার হয়। যাতে অধিকাংশ ব্যক্তি তথ্য পেতে ওয়েব সাইটে অনুসন্ধান করতে পারে।

লাইব্রেরি ডিজিটাল করার উপকরণসমূহ ঃ

একটি লাইব্রেরি কম্পিউটারাইজড তথা যান্ত্রিকীকরণের জন্য নিম্নলিখিত জিনিসগুলোর প্রয়োজন হয়। যেমনঃ

১. কম্পিউটার
২. সার্ভার
   সার্ভার আবার দুই ধরনের প্রয়োজন হয়। যথা:
   ক) ডাটা সার্ভার
   খ) ইন্টারনেট সার্ভার
৩. সফটওয়্যার (লাইব্রেরি সফটওয়্যার)
৪. স্ক্যানার মেশিন
৫. বারকোড রিডার
৬. প্রিন্টার মেশিন
৭. ইন্টারনেট সংযোগ
৮. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর
৯. এয়ার কন্ডিশনার
১০. আইপিএস/ইউপিএস
১১. ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা

১২. আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

নিম্নে বিষয়ভিত্তিক অনলাইন রিসোর্সের ওয়েব অ্যাড্রেস দেয়া হলো:

ইংরেজি

ইংরেজি বিষয়ক অনলাইন পাঠ উপকরণসমূহ:

Learning English (Games, puzzles, activities)
1) www.learnenglish.org.uk/kids/
2) www.primarygames.com
3)www.learnenglish.org.uk/magazine_current_frame.html
4) www.bbc.co.uk/schools/4_11/literacy.shtml
5) www.bbc.co.uk/skillswise/words/grammer/
6) www.funbrain.com
7) www.enchantedlearning.com/Home.html
8) www.fisher-price.com/us/playtime/

Dictionary
1) www.dictionary.cambridge.org/
2) www.wordcentral.com
3) www.ovidhan.org

Grammar
1) http://www.a4esl.org/g/h/grammar.html

Reading
1) www2.actden.com/writ_den/
2)www.penguindossiers.com/audio-frameset.asp

3)www.channel4.com/learning/microsites/B/bookbox/home.htm
4) www.readingrollercoaster.org.uk/
5) www.realbooks.co.uk
6) www.wordpool.co.uk

Vocabulary
1) http://a4esl.org/g/h/vocabulary.html

Listening
1) www.elllo.org
2) www.esl-lab.com

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান বিষয়ক অনলাইন পাঠ উপকরণসমূহ:

জীববিজ্ঞান
http://www.biology-online.org/dictionary/Main_Page
http://biology.about.com/
http://www.dmoz.org/Kids_and_Teens/School_Time/Science/Living_Things/
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html
http://www.biology4kids.com/
http://www.phschool.com/science/biology_place/glossary/index.html
http://www.kidsbiology.com/
http://www.biologyinmotion.com/
http://www.sparknotes.com/biology/

http://www.ibo-info.org/

পদার্থ	রসায়ন
http://physics.about.com/	http://scienceworld.wolfram.com/chemistry/
http://scienceworld.wolfram.com/physics/	http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/index.shtml
http://www.sparknotes.com/physics/	http://www.rsc.org/
http://scienceworld.wolfram.com/physics/	http://www.sparknotes.com/chemistry/
http://www.alcyone.com/max/physics/index.html	http://webbook.nist.gov/chemistry/
http://www.jyu.fi/tdk/kastdk/olympiads/	http://www.icho.sk/

গণিত

গণিত বিষয়ক অনলাইন পাঠ উপকরণসমূহ:

http://www.sparknotes.com/math/ http://mathworld.wolfram.com/ http://math.about.com/ http://www.sosmath.com/ http://www.mathacademy.com/pr/prime/ http://archives.math.utk.edu/ http://imo.math.ca/ http://www.matholympiad.org.bd/

সমাজবিজ্ঞান

http://en.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:Social_sciences_bookshelf
http://www.lib.umich.edu/govdocs/polisci.html
http://www.bangladeshsociology.org/index.htm
http://www.sociology.org/

ইতিহাস

http://en.wikibooks.org/wiki/History
http://www.besthistorysites.net/

বাংলাদেশের ইতিহাস

http://www.muktadhara.net/
http://www.profile-bengal.com/

ভূগোল

http://www.geographic.org/geography/geography.html
http://geography.about.com/
http://www.geography4kids.com/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_Bangladesh
http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas
http://www.mayerdak.com/homeland/maps.htm

ধর্ম

http://www.religionfacts.com/
http://islam.about.com/
http://www.al-islam.com/eng/
http://hinduism.about.com/
http://www.hinduism.fsnet.co.uk/
http://www.bhagavad-gita.org/
http://christianity.about.com/
http://www.christianity.co.nz/
http://net.bible.org/bible.php
http://webspace.ship.edu/cgboer/buddhaintro.html
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/index.html

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

http://homeschooling.about.com/od/homeeconomics

কৃষি বিজ্ঞান

http://www.ca.uky.edu/agripedia/subjectindex/

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক

http://muktijuddho.wikia.com
http://www.liberationwarmuseum.org
http://www.genocidebangladesh.org/
http://www.sectorcommandersforum.org/
http://jonmojuddho.org/home2.html

জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক

http://science.nasa.gov/Astronomy.htm
http://www.kidsastronomy.com/
http://www.cdli.ca/CITE/astronomy.htm
http://www.enchantedlearning.com/subjects/astronomy/glossary/
http://astronomybangla.com/index.php
http://www.issp.ac.ru/iao/

ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

http://www.boi-mela.com/
http://banglalibrary.evergreenbangla.com/
http://www.banglaacademy.org.bd

http://paschimbangabanglaakademi.org/

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক

http://www.englishlanguageguide.com/
http://www.english-online.org.uk/
http://www.english-the-easy-way.com/
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm
http://etext.virginia.edu/collections/languages/english/
http://eserver.org/
http://www.classicreader.com/
http://www.pitt.edu/~dash/folktexts.html